বিজয়গড়
একটি
উদ্বাস্তু
উপনিবেশ

দেবব্রত দত্ত

"বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ" গ্রন্থটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মুহূর্তে দেশবিভাগ-জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় জবর দখল করে গড়ে তোলা সর্বপ্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশের ইতিহাস।

একদিন যাঁদের সব ছিল, দেশবিভাগের ফলে সব ফেলে চলে আসা অসহায় সেই সকল ছিন্নমূল মানুষদের ভিখিরি জীবনের দুর্দশা কাটিয়ে উঠবার জন্য একান্তভাবেই আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং সম্পূর্ণভাবেই নিজেদের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম নিজেদের আবাসস্থল নিজেরাই গড়ে তুলবার ইতিহাস এই বিজয়গড়।

নিতান্তই সামাজিক দায়বদ্ধতায় এবং বেঁচে থাকবার তাগিদে সেদিন এই কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাঁরা, আজ তাঁরা প্রায় সকলেই লোকান্তরিত। তাঁদের সেই কর্মকাণ্ডকে স্বপ্রশংস দৃষ্টিতে সেদিন উৎসাহ দিয়েছিলেন অনেকেই। এমনকি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও এই অঞ্চল সম্পর্কে অবগত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "I am delighted to learn of the fine work done there and I congratulate them on it."

ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম গড়ে ওঠা এই বিজয়গড়ের সৃষ্টিলগ্নের ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

"বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ" সেদিনের সেই কর্মকাণ্ডেরই ইতিবৃত্ত; অসহায় কিছু মানুষের দুরন্ত কর্মপ্রচেষ্টার এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ইতিহাস।

বিজয়গড়
একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ

দেবব্রত দত্ত

প্রাক্তন সাংসদ, উদ্বাস্তু নেতা
অধ্যাপক সমর গুহ-র
ভূমিকা সংবলিত

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

VIJAYGARH EKTI UDBASTU UPANIBESH

Written by

DEBABRATA DUTTA

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ২০০১

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

অক্ষর বিন্যাস
বারাসাত বার্তা
২৭জি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

দাম ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র
(Rupees Seventy only)

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং ঊষা প্রেস, ৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত।

স্বর্গীয় সন্তোষকুমার দত্ত'র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

বিজয়গড়ের জনসাধারণকে—

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

"যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী"—পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম জবর-দখল করা উদ্বাস্তু কলোনী। সরকারী দাক্ষিণ্য বা অনুগ্রহে নয়—নিরন্তর আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে এই উদ্বাস্তু কলোনী উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকার লাভ করে। স্থায়ী পুনর্বাসনের কর্তৃত্ব অর্জন করে এই উদ্বাস্তু পল্লীর নতুন নামান্তর হয় "বিজয়গড় উদ্বাস্তু কলোনী"। বস্তুত, "বিজয়গড়"ই হলো পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আদি উদ্যমের প্রাথমিক স্মারণিক—উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সংগ্রামের আদি বিজয়-সৌধ-বিজয়গড়।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটে-মাটি-চ্যুত হয়ে আগত লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্র সরকার বৈমাত্রের ন্যায় আচরণ করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সরকারী উদ্যমে পাঞ্জাব, দিল্লী, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে সরকারী উদ্যম ও আর্থিক ব্যবস্থায় তাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বাস্তুহারার ভিখিরী জীবনের চরম দুর্দশার শিকার হতে হয়নি।

আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালী হিন্দু ও বৌদ্ধ-উদ্বাস্তুদের প্রতি কী আচরণ করেছিলেন নেহরু সরকার? দেশভাগের দশ বছর পর্যন্ত কিছু কিছু উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার জন্য সামান্য মাত্র রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি করে পণ্ডিত নেহরু এক অবাস্তব প্রত্যাশা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুরা আবার নিজেদের ভিটে-মাটিতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে। সেই প্রত্যাশা ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯৫৭ সালের পরে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয় ভারত সরকার।

কিন্তু দেশ ছেড়ে আসার পর থেকেই উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের আন্দোলন আরম্ভ করে। নিজেদের বাঁচাবার এই আন্দোলনে সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী"। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সুপরিচিত প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা সন্তোষকুমার দত্ত। সন্তোষবাবুর সহযোগী ছিলেন "কালাভাই" তথা ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে। নানা সভা সমিতি ও আন্দোলন

করার পরে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে এই নেতৃবর্গের কয়েকবার সাক্ষাৎকারও হয়। কিন্তু উদ্বাস্তুরা তখনও স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকার অর্জনে সক্ষম হয়নি।

পরবর্তী সময়ে সম্ভবত ১৯৫১ সালে, পূর্ববাংলার বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেন প্রয়াত ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়, বিপ্লবী নেতা অনিলচন্দ্র রায়, সংগ্রামী নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নেতৃবর্গ। জবর-দখল করা উদ্বাস্তু কলোনীর বিশেষ করে যাদবপুর অঞ্চলের বাস্তুহারা কলোনীগুলির স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকারের দাবীতে বিরাট গণ সত্যাগ্রহ করা হয়। এই সত্যাগ্রহ দমন করার জন্য সরকার ব্যাপক পুলিশী নির্যাতনের ব্যবস্থা নেয়। এই সত্যাগ্রহে নেতৃবর্গের সঙ্গে কয়েক শত সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এঁদের সবাইকে রাত কাটাতে হয় পুলিশের হেফাজতে।

পরের দিন নেতৃবর্গকে মুক্তি দিয়ে এঁদের সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। সুদীর্ঘ আলোচনার পরে গভীর রাতে সরকারের সঙ্গে একটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন-চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীর জবর-দখল কলোনীটি স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকার লাভ করে। বস্তুত, 'যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী'ই সর্বপ্রথম সরকার স্বীকৃত উদ্বাস্তু কলোনী তথা সমগ্র উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যাদবপুর এবং দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে অগণিত জবর-দখল কলোনী গড়ে ওঠে এবং পরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের চুক্তি অনুযায়ী এই কলোনীগুলিও স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকার অর্জনে সক্ষম হয়। যাদবপুর অঞ্চলের উদ্বাস্তু আন্দোলনের বিজয়ের পর এই বাস্তুহারা পল্লীটির নতুন নামকরণ হয় বিজয়গড় কলোনী। বাস্তুহারাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের সংগ্রামী অধিকার অর্জনের পরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য জবর-দখল করা উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে ওঠে এবং স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকার লাভ করে।

"যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী"কে কেন্দ্র করে যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গড়ে ওঠে তা' পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই আন্দোলনে স্বর্গীয় বিপ্লবী নেতা সন্তোষকুমার দত্ত ও তাঁর সহযোগীদের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীকে কেন্দ্র করে যে উদ্বাস্তু সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তার কাহিনী লিখে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই ইতিহাস রচনায় সন্তোষবাবুর পুত্র শ্রীমান দেবব্রত দত্ত (শংকর) যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা যথার্থই প্রশংসনীয়। বইটির প্রথম সংস্করণে অনেক তথ্য ও ঘটনাবলীর কথা হয়তো যথার্থভাবে সংযোজিত করা সম্ভব হবে না। কারণ, সেই যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীর উদ্বাস্তু আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রায় সমস্ত নেতৃবর্গই আজ কালান্তরে। তবুও আশা করা যায় যে বর্তমান বিজয়গড় কলোনীর অধিবাসীরা সেদিনের উদ্বাস্তু আন্দোলনের অসম্পূর্ণ কাহিনীর তথ্যগুলি সরবরাহ করায় এই বইটিকে একটি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ইতিহাসে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। আশাকরি, যে সমস্ত তথ্য অসম্পূর্ণ থাকবে সেই তথ্যগুলিও পরবর্তীকালে সংগ্রহ করে এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আরো বিশেষভাবে উন্নত করে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

এই বইটি লেখার জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

২৯.০৪.৯৭ — সমর গুহ

কয়েকটি কথা

স্বাধীনতার মুহূর্তে দেশ-বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা সর্বপ্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশ "বিজয়গড়" সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্ভবত এতদিন পরে আজ আর তেমন করে রচনা করা সম্ভব নয়। এর কারণ একটাই। যাঁরা সেদিন তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে এই অঞ্চলকে একটি আদর্শ বাসযোগ্য অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা তাঁদের কাজের "*Document*" তেমন কিছুই রেখে যাননি। আসলে তাঁদের কাজের ভিতর কোন প্রকার অহংবোধ কাজ করেনি সেদিন। আত্মগরিমা প্রচারের কোন উদ্দেশ্যই ছিল না তাঁদের ভিতর। শুধুই কাজের আনন্দে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতায় তাঁরা কাজ করে গেছেন।

তবুও এই দীর্ঘ ব্যবধানে কিছু স্মৃতি, কিছু শ্রুতি আর কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই ইতিহাস রচনা করবার প্রয়াস।

স্মৃতি অর্থে যেটুকু মনে আছে। আর শ্রুতি অর্থে বিভিন্ন শ্রদ্ধেয় জনের মুখে বিভিন্ন সময়ে যা শুনেছি। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার দত্ত'র একান্ত সহযোগী শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই) যিনি এই এলাকাকে গড়ে তুলবার কাজে শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার দত্ত'র সাথে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং এই এলাকার সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘদিন, তিনি এই বিজয়গড়ের ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কাছে আমাদের সামনে যা সব বর্ণনা করেছিলেন।

আর তথ্য বলতে সামান্য কিছু "*Document*" যা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এ ভিন্ন কয়েকটি গ্রন্থেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এই এলাকার প্রবীণ উদ্বাস্তু অধিবাসী, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং এক সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত "সোনার বাংলা" পত্রিকার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার গুহ কর্তৃক সংরক্ষিত কিছু তথ্য এই রচনার বিশেষ উপজীব্য।

ইতিহাস সব সময়ই তথ্যনির্ভর। নিছক খেয়াল খুশি বা কল্পনানির্ভর নয়। বলা বাহুল্য, এই রচনা একান্তভাবে তথ্যনির্ভর করেই লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই উদ্বাস্তু উপনিবেশের সৃষ্টিলগ্নের ঘটনাপঞ্জীগুলো লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করতে যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহিত করেছেন, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয়

ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই) যিনি তাঁর জীবদ্দশায় এই সকল ঘটনাপঞ্জী সংবলিত একটি গ্রন্থ যাতে প্রকাশিত হয় সেই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন, এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে, বর্তমান যে সকল নেতৃস্থানীয় বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই সময়ের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে, লিপিবদ্ধ করতে আমাকে সাহায্য করেছেন।

এই গ্রন্থটি শুধুই মোটা তুলির টানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের রেখাচিত্র ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস মাত্র। এই রেখাচিত্রকে অবলম্বন করে, আরো বিস্তৃত রচনায় যাঁরা আগ্রহী তাঁরা হয়তো বা সেই কাজটি সম্পন্ন করতে পারবেন এবং এই তথ্যভিত্তিক গ্রন্থটি তাঁদেরকে সাহায্য করবে বলেই আশা রাখি। এই কর্মযজ্ঞে অগ্রণী আরো অনেকজনের নাম হয়তো এই গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে এবং সেটা নিতান্তই অনবধানতাবশত। তার জন্য অবশ্যই আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

নব্য প্রজন্মের যুবক যুবতী যারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সেই সময়ের সেই সব কর্মযজ্ঞ দেখবার সুযোগ লাভ করেনি, তাদেরকে এই গ্রন্থের মাধ্যমে শুধুই স্মরণ করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা যে তাদেরই পূর্বপুরুষদের অক্লান্ত কর্মের মাধ্যমে এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সুচিন্তিত এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলেই গড়ে উঠেছিল এই উদ্বাস্তু উপনিবেশ। স্মরণীয় সেই সকল ব্যক্তিদের কর্মপ্রচেষ্টার ফসলকে টিকিয়ে রাখবার এবং আরো সুন্দর করে তুলবার দায়িত্ব মূলত এই নতুন প্রজন্মেরই। আর সেটা সম্ভব এই স্থানের প্রতি মমত্ব গড়ে তুলে নিজেদের ভিতর সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধনের মাধ্যমেই।

অনুগ্রহ করে এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, লোকসভার প্রাক্তন সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ মহাশয় যিনি দেশভাগের পরেও কয়েক বছর পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন এবং পাকিস্তান জেলেও আবদ্ধ ছিলেন কিছুদিন। পুনরায় আসন্ন গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য ১৯৫০ সালের শেষদিকে কলকাতা চলে আসতে বাধ্য হন। এখানে এসেই তিনি উদ্বাস্তু আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার দত্ত'র বিশেষ অনুরোধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার আগে, বছরখানেকের জন্য বিজয়গড় কলেজেও তিনি অধ্যাপনা করেন। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন কবি প্রফুল্লকুমার দত্ত, কবি অনল চৌধুরী এবং কবি বরুণ চক্রবর্তী। কবি এবং প্রাবন্ধিক শ্রীযুক্ত তপন সেনগুপ্ত "ইতিহাস পরিষদ"-এর জন্য যদি একরকম জোর করেই আমাকে দিয়ে এই

ইতিহাস রচনা করিয়ে না নিতেন, তা হলে হয়তো আজও এই ইতিহাস লেখা হয়ে উঠত না। আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ অধ্যাপক বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বিমলকুমার রায়ের কাছে, তাঁদের সহযোগিতার জন্য।

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন "প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স"-এর পক্ষে শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ বসু এবং শ্রীমান কমল মিত্র। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। এঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

দেবব্রত দত্ত

৯/১১/২, বিজয়গড়
যাদবপুর
কলকাতা-৩২
২৫শে বৈশাখ, ১৪০৭
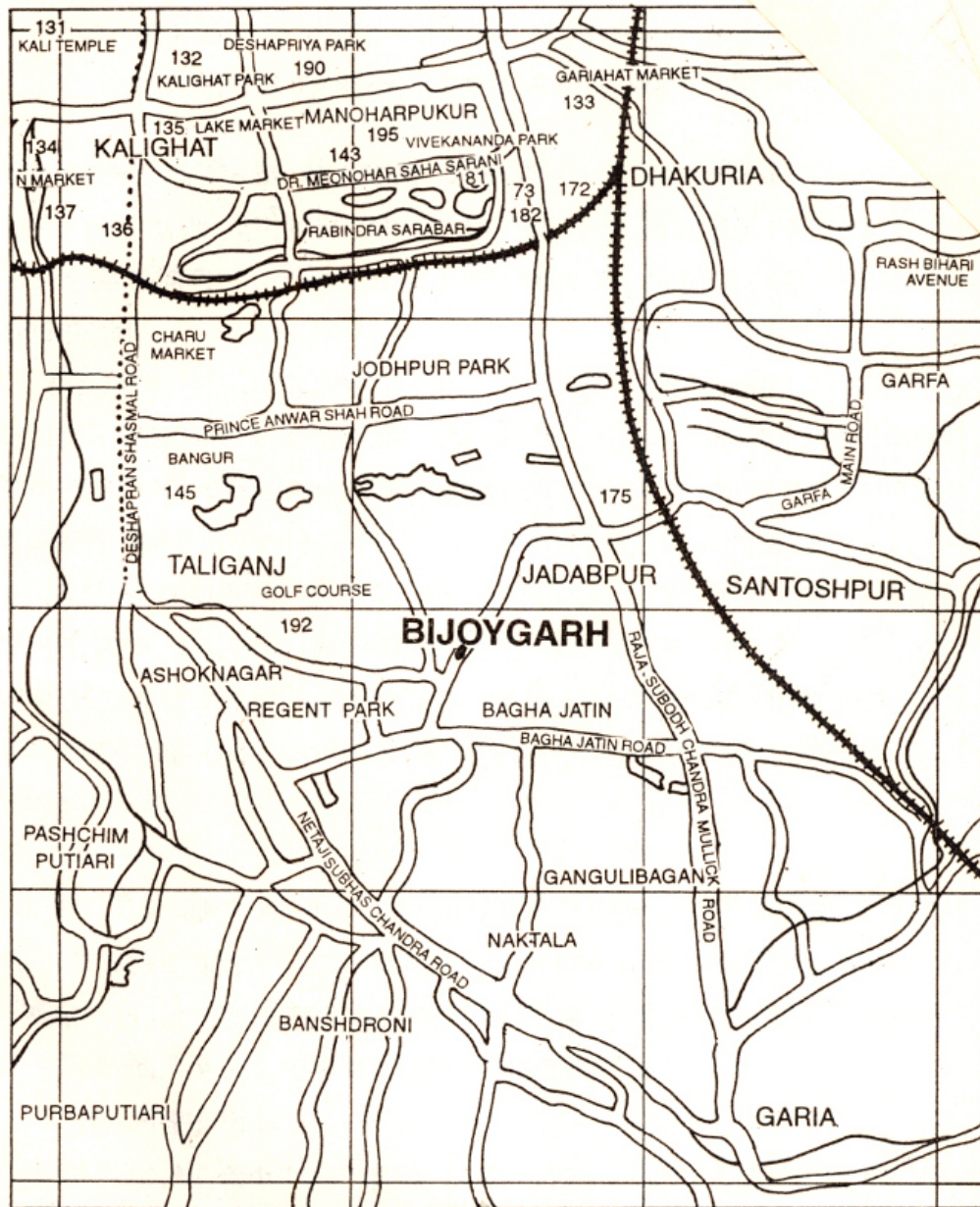
দক্ষিণ কলকাতার কিছু অংশ এবং বিজয়গড়ের অবস্থান

এক

উদ্বাস্তু পল্লী গড়ে উঠবার পশ্চাৎপট। এই অঞ্চলের তৎকালীন অবস্থা। উদ্বাস্তু পল্লীর প্রতিষ্ঠা। লয়েলকার সাথে সংঘর্ষ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্বাস্তু পল্লী পরিদর্শন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঙালী জাতির অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্তেই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভূ-খণ্ডকে ভাগ করে গোটা বাঙালী জাতিকেই ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিধা বিভক্ত করে দেওয়া হল।

যাঁরা শুধু দিয়েই গেলেন পেলেন না কিছুই, তাঁরাই এসে ভিড় করতে লাগলেন শিয়ালদহ'র প্ল্যাটফর্মে। এঁরা উদ্বাস্তু। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার মুহূর্তেই দেশভাগের যূপকাষ্ঠে বলি হলেন পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীরা। পূর্ববঙ্গের যে হিন্দুদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামে, তাঁরাই বেরিয়ে এলেন দলে দলে ঘর ছেড়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় নতুন পরিচয় নিয়ে। এঁরা উদ্বাস্তু। পথ তাঁদের অজানা। ভাগ্য তাঁদের বিড়ম্বিত। একদিন যাঁদের সব ছিল, আজ ক্ষুধায় তাঁদের অন্ন জোটে না, পরনে বস্ত্র নেই, মাথার উপর ছাউনি নেই। ভবিষ্যতের শিক্ষার কোন সম্ভাবনা নেই।

তবুও বাঁচতে হবে।

আর উদ্বাস্তুদের বাঁচবার এবং বাঁচাবার তাগিদ নিয়েই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার দত্ত'র বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং সভাপতিত্বে কলকাতার উপকণ্ঠে সেদিন গড়ে উঠতে শুরু করল সর্বপ্রথম জবর-দখল কলোনী "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী" পরে যার নাম হয়েছে "বিজয়গড়"।

এ এক বিস্তৃত ইতিহাস।

বঙ্গ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বেই দেশনেতাগণ, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীদের কথা মাথায় রেখেই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে অবিভক্ত বঙ্গের স্বদেশ (Home Land) রূপেই সৃষ্ট হবে পশ্চিমবঙ্গ। সাম্প্রদায়িক গোলমালে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের যদি চলে আসতেই হয় তবে পশ্চিমবঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে পুনর্বাসন করা হবে তাঁদের।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণেও জওহরলাল নেহরু, যাঁরা স্বাধীন ভারত ভূ-খণ্ডের বাইরে থেকে গেলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করলেন, ".......They are of us and will remain of us what ever may happen......."

মহাত্মা গান্ধীও ১৯৪৭ সালের ২১শে জুলাই তাঁর প্রার্থনা শেষের বক্তৃতায় বললেন : "My friends ask whether those who being mortally afraid or otherwise leave Pakistan will get shelter in the Indian Union. My opinion is emphatic on this point : such refugees should get proper shelter in the Indian Union and vice-versa. The friends again ask as to what will happen about the lands and buildings if any left in Pakistan. I have said repeatedly that the state should pay the present market price of the lands and buildings left at Pakistan." যদিও মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারার সেই উদারতা পরবর্তীকালে বহুক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি।

এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে তৎকালীন দেশনেতাগণ একথা অবশ্যই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে ধর্মীয় ভিত্তিতে যে দেশভাগের সৃষ্টি, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের পক্ষে পাকিস্তানে বসবাস করা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠবে না।

এই জাতীয় আশঙ্কার পিছনে যথেষ্ট কারণও ছিল।

সুরাবর্দী সাহেব যখন অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি মিঃ এইচ. এম. এস. ঈশাক, আই. সি. এস. এবং তাঁর সহকারী রূপে কৃষি পরিসংখ্যানের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার চারুচন্দ্র সেন মহোদয়গণকে পশ্চিম-বঙ্গের সমস্ত চাষযোগ্য পতিত জমি পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত তিন খণ্ড রিপোর্টে দেখা যায় যে দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে ১৮ লক্ষ ২৮ হাজার একর চাষযোগ্য পতিত জমি পড়ে ছিল। এই হিসাবের ভিতর অবশ্যই শ্মশান, গোচারণ ভূমি, পুকুর, নদী, খাল, বিল ও অন্যান্য পুনর্বাসনের অনুপযুক্ত স্থান ধরা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে সুরাবর্দী সরকার ১৯৪৭ সালের ১১ই মার্চ "বেঙ্গল এ্যাকুইজিশন অব ওয়েস্ট ল্যান্ড" নামে একটি বিল প্রণয়ন করে কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই বিহার থেকে আগত হাজার হাজার মুসলমান উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রায় বিনা শর্তে এই জমি বিতরণ করে দেওয়া। মিঃ ফজলুর

রহমানের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট ১৯৪৭ সালের ৮ই মে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ যাতে পাকিস্তানের কুক্ষিগত হতে পারে সেটাই ছিল এর বিশেষ উদ্দেশ্য। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই তাড়াহুড়ো করে এই বিলটিকে আইনে পরিণত করবার সমস্ত রকম প্রচেষ্টাই চালানো হয়। কিন্তু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি এবং বিরোধীদলের সদস্যদের কর্মদক্ষতায় বিলটি আইনে পরিণত করা সম্ভব হল না।

এর আগেই ১৯৪৬ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ জুড়ে মারাত্মক দাঙ্গা ঘটে গেছে। এই দাঙ্গা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

"বাংলা দেশের মুসলিম লীগ সরকার যা হাসান শহীদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ বুঝেছিল ব্যাপক হিন্দু হত্যা, যার ফলে ১৬ই আগস্ট তারিখে কলকাতায় সরকারী উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ব্যাপক গণ হত্যা চালান হয়। যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ঐ দিন সরকারীভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত মুসলিম জনতাকে হত্যালীলা ও ধ্বংস কার্যে উৎসাহিত করা হয়। কুখ্যাত গুণ্ডাদের মুক্ত করে দেওয়া হয় ও পুলিশকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে নারকীয় হত্যালীলা চলে তাতে অন্যূন ৬০০০ লোক নিহত, ১৫০০০ লোক আহত এবং ১০০,০০০ লোক গৃহহারা হয়। ১৬ই আগস্টের পরবর্তী দিনগুলিতেও এই হত্যালীলা অব্যাহত ছিল, কিন্তু তা আর এক তরফা ছিল না। এবং তারই ফলে শেষ পর্যন্ত কিছুটা শান্তি আসে।"

এই সব ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই, পূর্ববঙ্গ যখন পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে ঘোষিত হল, তখন সেই স্থানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবেই ঘোষিত হল এবং বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বহু জায়গায় হিন্দু অধিবাসীদের উপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু হল। দলবদ্ধভাবে পালাতে শুরু করলেন হিন্দুরা। পিছে পড়ে রইল তাঁদের সাতপুরুষের ভিটে বাড়ি। পালাতে গিয়ে অনেক পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল অন্য পরিবারের কাছ থেকে। নিকটজনের কাছ থেকে হারিয়ে গেলেন অনেক নিকটজন। সেই নিকটজনকে আর কোনদিন তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কিনা কে জানে!

তাঁরা প্রাণ এবং মান বাঁচাবার তাগিদে দলে দলে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা পার হয়ে এ-পারে চলে আসতে লাগলেন। এ যেন এক জনস্রোত।

এ পার থেকেও সেই সময় কিছু মুসলমান ওপারে চলে গিয়েছিলেন ঠিকই

কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

ভারতবর্ষের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ সেদিন যে আন্তরিকতা নিয়ে আশার বাণী শুনিয়ে ছিলেন, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু সেই আন্তরিকতার অভাব ছিন্নমূল মানুষকে হতাশ করে তুলল।

এই সব ছিন্নমূল মানুষদের নতুন নামকরণ হল, "উদ্বাস্তু"।

যদিও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যার কিছুটা সমাধান সরকারী আনুকূল্যে ঘটল ঠিকই কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সরকারী ঔদাসীন্য প্রকট হয়ে দেখা দিল।

শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম ভরে গেল উদ্বাস্তুদের ভীড়ে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, যে-কোন সময়ে সংক্রামক অসুখ ছড়িয়ে পড়বার উপক্রম হল।

সরকার পরিচালনাধীন বিভিন্ন শিবিরে 'ডোল' ব্যবস্থায় এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। আর এরই ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ল নিজস্ব তাগিদে নিজেদের বাসস্থান নিজেরা গড়ে তুলবার।

বাসস্থান তৈরীর আকাঙ্ক্ষায় কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উপযুক্ত জমির অন্বেষণে বের হয়ে যাদবপুর ও টালিগঞ্জের মধ্যবর্তী এক জনহীন প্রান্তরের সন্ধান পাওয়া গেল। গত মহাযুদ্ধের সময় সরকারী প্রয়োজনে এই ভূমিখণ্ড সরকারী তরফ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কয়েক বৎসর এখানে মার্কিন সৈন্যদের ঘাঁটি ছিল। যুদ্ধাবসানে তারা চলে গেলে তাদের কিছু পরিত্যক্ত ঘর পড়ে থাকে। ঐ সকল কাঠের তৈরী ঘরেই প্রথমে এসে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেন কিছু উদ্বাস্তু।

এই ভূমিখণ্ডটি এক সময় মার্কিন সৈন্যদের ঘাঁটি থাকবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আশপাশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা উন্নত ছিল। যাদবপুর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা গিয়েছিল এই ভূ-খণ্ডটির মাঝখান দিয়েই। আর এর চতুর্দিকেই ছড়ানো ছিল অসংখ্য কংক্রীটের বাঁধানো তিন ফুট পরিমাণ চওড়া রাস্তা।

মিলিটারীদের ব্যবহৃত কাঠের ঘর বাদেও বড় আকারের একটি ব্যারাক ছিল এখানে। তার উল্টোদিকেই ছিল তাদের রিক্রিয়েশন সেন্টার নামে একটি বিরাট হল ঘর। আর ছিল একটি ওয়্যারলেস অফিস।

সেই সময়ে যাদবপুরে সামান্য কিছু জনবসতি ছিল মাত্র। তার ভিতর কিছু ছিলেন স্থানীয় মুসলমান, আর কিছু সংখ্যক ছিলেন পূর্ববঙ্গেরই হিন্দু যাঁরা দেশ-ভাগের আগেই এখানে স্থান করে নিয়েছিলেন।

এখন যেখানে যাদবপুর বাস-স্ট্যাণ্ড, তখন সেখানে ৮০ নং বাস চলাচল করত। বালিগঞ্জ থেকে যাদবপুর হয়ে টালিগঞ্জ ট্রামডিপো পর্যন্ত যেত বাসটি। সন্ধ্যা ৭টা-৮টার পরেই বন্ধ হয়ে যেত সেই বাস।

বাস-স্ট্যান্ডে কয়েকটা মাত্র দোকান ছিল তখন। কেরোসিনের আলো জ্বালিয়ে ব্যবসা চলত। বাস বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথেই দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে যেত সব। তখন চারদিকে এক ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে আসত।

শেয়াল, সাপ, জোঁক ছিল নিত্যকার সাথী। অল্প বৃষ্টিতেই আশপাশ এলাকায় জল জমে যেত প্রচুর। এই অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে যে পাকারাস্তা চলে গিয়েছিল রাণীকুঠি পর্যন্ত, তার দুই পাশেই ছিল প্রশস্ত কাঁচা ড্রেন। এই ড্রেনই ছিল জল নিষ্কাশনের একমাত্র ব্যবস্থা।

বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর (কালাভাই) বক্তব্য থেকে জানা যায় যে সেই সময় যে সকল উদ্বাস্তু পরিবার অনন্যোপায় হয়ে এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের মনে সব সময়ই একটা আশঙ্কা ছিল এখান থেকে উচ্ছেদ হবার। এই স্থানটি ছিল তখন পর্যন্তও নিতান্তই একটি অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবির।

এই এলাকার অনেক জমিই ছিল ধনী মারোয়াড়ির। যথা লয়েলকাদের এবং অন্যান্য বিত্তশালী মানুষের। স্বাভাবিকভাবেই সরকারী অথবা বেসরকারী তরফ থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কা উদ্বাস্তুদের ছিলই। কেননা মিলিটারী অধিকৃত জায়গা সরকারী অধিকৃত হলেও তার আশপাশের জায়গাও এর ফলে ক্রমেই অরক্ষিত হয়ে পড়ছিল।

এই সময় ১৯৪৮ সালেই পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী যুগান্তর দলের পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর শাখার অন্যতম নেতা, সংগ্রামী পুরুষ, সন্তোষকুমার দত্তকে সভাপতি করে তাঁরই নেতৃত্বে এই অঞ্চলকে একটি স্থায়ী উদ্বাস্তু অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলবার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই হিসাবেই যিনি পরিচিত ছিলেন) এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনিও ছিলেন পূর্ববঙ্গের বরিশালের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সুবক্তা। পরবর্তীকালে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সহ-সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় সুকুমার চ্যাটার্জী মহাশয়। অফিস পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হন শ্রদ্ধেয় বিনয় দত্ত। তাঁর অবদানও এই সময় ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। প্লটের সীমানা নির্ধারণের কাজ চালাতে থাকেন শ্রদ্ধেয় চিত্ত দে, শ্রদ্ধেয় হেমন্তকুমার ধর, শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র ধর

এবং অন্যান্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ।

এরপর থেকেই এই জায়গায় সন্তোষকুমার দত্ত'র নেতৃত্বে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়ে যায়।

যাঁরা ছিলেন বাস্তুচ্যুত অসহায় মানুষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মুহূর্তে দেশ বিভাজনের ফলে প্রায় একবস্ত্রে ওপার বাংলার বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, বেঁচে থাকবার সামান্য অবলম্বনটুকুও ছিল না যাঁদের, তাঁরাই এসে ভিড় করতে লাগলেন এই অঞ্চলে। এই নবগঠিত উদ্বাস্তু অঞ্চলে তাঁরা খুঁজে পেলেন তাঁদের বাসভূমি। জীবনে বেঁচে থাকবার এবং সন্তান-সন্ততিদের বাঁচিয়ে রাখবার প্রত্যাশা। সেদিনের সেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যদি সেদিন এইভাবে এই অঞ্চলকে একটি স্থায়ী উদ্বাস্তু অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা না চালাত, তা হলে সেদিনের সেই সকল অসহায় উদ্বাস্তু মানুষদের ভাগ্যে কি ঘটত জানি না।

খুব শীঘ্রই এই অঞ্চল উদ্বাস্তুদের আগমনে প্লাবিত হয়ে উঠল। যে অঞ্চল ছিল একদিন প্রায় মনুষ্যহীন, সেই অঞ্চলই হয়ে উঠল উদ্বাস্তু মানুষদের কলরবে মুখর। অবিশ্রাম চলতে লাগল কর্মযজ্ঞ। এ যেন সেই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভূমিকে বাসযোগ্য করে যাবার এক দৃঢ় অঙ্গীকার।

এই এলাকায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করবার ফলে তৎকালীন জনসাধারণের কাছে এবং তদানীন্তন সরকারী মহলে সন্তোষকুমার দত্ত খুব শীঘ্রই একজন উদ্বাস্তু নেতা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠলেন। যদিও ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেই নেতৃমহলে তাঁর পরিচিতি ছিল সুবিদিত।

শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার দত্ত'র সহধর্মিণী ছিলেন শ্রদ্ধেয়া প্রকৃতি দত্ত। তাঁর নিরন্তর সহযোগিতাই সন্তোষকুমার দত্তকে সেদিন সাহায্য করেছিল উদ্বাস্তু আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সেই সময় আরো অনেক শ্রদ্ধেয় মহিলা এ-ভাবেই নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়ে গেছেন তাঁদের নিকটজনদের, এই অঞ্চল গড়ে তুলবার কাজে। সেই দারুণ সংকটের সময় একান্তভাবেই নিজেদের বাঁচবার এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদে। এই সকল শ্রদ্ধেয়া মহিলাদের সেই সময়ের অবদানও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্যাতিত বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ পূর্ববঙ্গবাসী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হিন্দু সম্প্রদায় তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য পর-নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে স্ব-

প্রচেষ্টায় বাস্তু তৈরির প্রয়াসে এই ভূমিখণ্ড সার্থক ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। যখন তাঁরা বুঝলেন সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে শীঘ্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই এবং সরকারী পরিচালনাধীন বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করে অনির্দিষ্টকাল অনিশ্চিতভাবে কাটাতে হবে, তখনই তাঁরা এই জবর-দখল উপনিবেশ গড়ে তুলবার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯৪৮ সালেই নবগঠিত নেতৃত্বের অধীনে এই এলাকা "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী" নামকরণের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে ওঠে।

নিজেদের জীবন-নির্বাহের জন্য এবং ভবিষ্যত বংশধরদের সুনাগরিক রূপে গড়ে তুলবার চিন্তায় জাতীয় সরকারকে বিব্রত না করে কিভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুব্যবস্থা করা যায়, এই অবৈধ মাথা গুঁজবার স্থান গড়ে তুলবার পক্ষে এটাও ছিল একটা কারণ। সরকারী পরিচালনাধীন বিভিন্ন শিবিরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্ত থাকবার ঐকান্তিক আগ্রহও এই উপনিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বিভিন্ন জেলার অধিবাসী শিক্ষিত হিন্দুরা মিলিটারীদের দ্বারা প্রস্তুত প্রশস্ত পাকা বড় রাস্তার উভয় পার্শ্ববর্তী প্রায় চারশত বিঘা জমির উপর টিন, টালি, বাঁশ ও কাঠের তৈরী নানা প্রকার কুটীর তৈরী করে বাস করতে আরম্ভ করলেন।

যাঁরা নিজেদের বাঁচবার প্রয়োজনে সকল বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজেদের অর্থে ও পরিশ্রমে ধীরে সুস্থে এই উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা আর এখন একে সাময়িক আবাসভূমি হিসাবে মনে করলেন না। স্থায়ীভাবে বাস করবার আগ্রহ নিয়েই তাঁরা ঘর নির্মাণ করতে শুরু করলেন। ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই)-র বক্তব্য থেকে জানা যায়, সেই সময় ঠিক ছিল সরকারী অধিকৃত জমির ভিতরই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে।

পাকা রাস্তাকে কেন্দ্র করে তার উভয় পার্শ্বে এক থেকে নয় পর্যন্ত নয়টি ওয়ার্ড সুনির্দিষ্টভাবে গড়ে উঠল। এই ওয়ার্ড বিভাজনে সেদিন কিন্তু তাঁরা যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। যাদবপুরের দিক থেকে বিজয়গড়ে প্রবেশ করতেই যেখান থেকে বিজয়গড় শুরু সেখানে রাস্তার বাঁ হাত থেকে শুরু হল এক নম্বর ওয়ার্ড। শেষ হল একটা নির্দিষ্ট রাস্তার সামনে এসে। রাস্তা পার হয়েই আবার শুরু হল দুই নম্বর ওয়ার্ড। এমনি করে পাঁচ নম্বর পর্যন্ত গিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে এসে আবার ছয় নম্বর ওয়ার্ড। এইভাবে নির্দিষ্ট সীমারেখা বরাবর সাত নম্বর এবং আট নম্বর হয়ে এক নম্বর ওয়ার্ডের উল্টোদিকে এসে শেষ হল নয় নম্বর ওয়ার্ড।

কিন্তু অতি দ্রুতহারে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে অধিকৃত জায়গাটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব হল না। বর্তমানে যেটা দশ নম্বর ওয়ার্ড এবং এগারো নম্বর ওয়ার্ড, যে দুটো প্রায় একই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল, সেখানেও উদ্বাস্তু বসানো প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

এই সংলগ্ন জমির একটা অংশ ছিল তৎকালীন জমিদার লয়েলকার। সেই জমি লয়েলকা বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। কিন্তু উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনে একদিন রাতারাতি সেই জায়গা দখল করে নিয়ে উদ্বাস্তুদের ভিতর ভাগ করে দেওয়া হয়। উদ্বাস্তুদের আগমন বৃদ্ধি পাওয়ায় তৎকালীন কলোনী কমিটির কাছে একাজ করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ও তখন ছিল না।

লয়েলকা অনেক চেষ্টা করেও এই জায়গা উদ্ধার করতে না পেরে ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি একদিন দুপুরে কয়েক লরি ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়ে এই জায়গা উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন।

তখন দুপুর। নবগঠিত উদ্বাস্তু পল্লীতে নতুন করে তখন ঘর বাঁধবার কাজ চলছে। কোথাও কাঁচা বাঁশে কোপ পড়ছে কুড়ুলের। শব্দ উঠছে ঠক্ ঠক্। টালি অথবা টিনের ছাউনি উঠছে কারো চালের উপর। কোথাও বা ঘরের ভিত প্রস্তুত হচ্ছে মাটি দিয়ে ঘরের পাশেই কোথাও গর্ত খুঁড়ে।

যাদের ঘর বাঁধা হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই, সেখানে স্ত্রীলোকেরা ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের সংসারের কাজে। পুরুষেরা বেরিয়েছিলেন অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায়। পেট তো কিছুতেই মানে না! ক্ষুধা যে বিষম বস্তু। একটি দিন কোনক্রমে পার হয়ে গেলে আর একটি দিন দুয়ারে এসে উঁকি মারে। ক্ষুধার অন্নের সংস্থান করতে হয়। আর তার জন্য প্রয়োজন অর্থ উপার্জন। এই অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টাতেই তখন কেউ চালাচ্ছিলেন এই অঞ্চলেই ছোট্ট একটা দোকান, কেউ বসেছিলেন সামান্য সব্জি নিয়ে রাস্তার পাশেই। কেউবা বেরিয়েছিলেন চাকরির সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায়।

হঠাৎ বেজে উঠল বিউগল, কাঁসর, ঘণ্টা। সচকিত হয়ে উঠল সমগ্র উদ্বাস্তু পল্লী। যে সকল পুরুষরা ঘরে ছিলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন দলে দলে। ঘন ঘন বিউগল বেজে চলল দুপুরের রৌদ্রের ভিতর। সকলেই বুঝে নিলেন, এ কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণের সংকেত ধ্বনি। এই জাতীয় আক্রমণের আশঙ্কা তৎকালীন উদ্বাস্তুদের ভিতর ছিলই। আর তারই জন্য ছিল পাহারার ব্যবস্থা। বাইরের শত্রুর কোন আক্রমণ হলেই কাঁসর, ঘণ্টা, বিউগল বাজিয়ে সকলকে

জানিয়ে দেবার নির্দেশ।

প্রথমে তাঁরা কান সজাগ করে শব্দ কোন দিক থেকে আসছে সেটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর ছুটলেন সেই দিকে যেদিক থেকে বিউগলের আওয়াজ আসছিল। ইতিমধ্যে বহু মানুষের কোলাহল ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল লয়েলকার মাঠ ঘিরে। সন্তোষকুমার দত্ত নিজেও ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে।

তখন লয়েলকার মাঠে শুধুই আগাছার ভিড়। শণ গাছ ভর্তি পুরো জায়গাটাই। কোনো ঘর-বাড়ী নেই। নীচু জায়গা, অল্প বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে যেত। সেখানে শুরু হলো সংগ্রাম উদ্বাস্তুদের সাথে লয়েলকার পাঠানো কয়েক লরি গুণ্ডাদের, লয়েলকা যাদের নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এই অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তুদের তাড়িয়ে এই অঞ্চলকে উদ্বাস্তু মুক্ত করে পুনর্দখল করে নেবার জন্য।

উদ্বাস্তুদের সাথে গুণ্ডাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হল। সংঘর্ষের পর বহু গুণ্ডা আহত হয় এবং তারা ক্রমে পিছু হটতে শুরু করে এবং পলায়ন করে। উদ্বাস্তুদের ভিতরও শ্রদ্ধেয় মণি পাল সহ বহুজন আহত হন। এটাই লয়েলকার সাথে বিজয়গড়ের উদ্বাস্তুদের বিখ্যাত সংঘর্ষ নামে পরিচিত। এই সংঘর্ষে তৎকালীন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররাও উদ্বাস্তুদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লয়েলকা চিত্ত দে সহ কয়েকজনকে আসামী করে এই উদ্বাস্তু উপনিবেশের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মহামান্য কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মামলার রায় লয়েলকার পক্ষে না যাওয়ায় এই ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটল। এড্‌ভোকেট কানাইলাল বসু সেই সময় এই মামলায় উদ্বাস্তুদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এড্‌ভোকেট চিন্তাহরণ রায়, এড্‌ভোকেট গিরিন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শান্তিভূষণ রায়চৌধুরী এঁদের সহযোগিতাও সেই সময় ছিল উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যদের অস্থায়ী শিবির স্থাপনের জন্য সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জায়গার উপর এই উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠতে শুরু করল ঠিকই কিন্তু তৎকালীন নেতৃবৃন্দের দুশ্চিন্তা শেষ হল না। সব সময় একটা আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছিল উচ্ছেদ হবার। এই অধিগৃহীত জায়গার ভিতর অনেক জমিদার এবং ছোট মালিকদের জায়গা ছিল। যুদ্ধ পরিসমাপ্তিতে মার্কিন সৈন্যরা স্থান ত্যাগ করে গেলে তাঁরা সেই জায়গা ফিরে পাবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, এই অঞ্চল গড়ে উঠবার প্রায় শুরুতেই একদিন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে সন্তোষকুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ

রায়চৌধুরী (কালাভাই)-কে সাথে নিয়ে তাঁর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং এই উদ্বাস্তু উপনিবেশের বিষয়ে তাঁদের ভিতর কথা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁদেরকে এই অঞ্চলের পরিবর্তে নাকতলায় গিয়ে উদ্বাস্তু উপনিবেশ স্থাপন করবার পরামর্শ দেন (যার উল্লেখ চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে)।

এই রকম একটা অনিশ্চিত অবস্থার ভিতর যখন উদ্বাস্তুদের দিন কাটছিল, সেই সময় এই উদ্বাস্তু পল্লীর তৎকালীন নেতৃবৃন্দের আহ্বানে একদিন শ্রদ্ধেয় জননেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই পল্লীতে পদার্পণ করেন। এই উপলক্ষে এখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি এই উদ্বাস্তু উপনিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং স্থানীয় উদ্বাস্তুদের আশ্বস্ত করে বলেন যে এখানে আবাসস্থল গড়ে তুলবার সম্পূর্ণ নৈতিক অধিকার তাঁদের রয়েছে। দেশভাগের সময় তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দেওয়া আশ্বাসের কথাও তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন।

সভাশেষে সন্তোষকুমার দত্ত'র সাথে তিনি এই উদ্বাস্তু পল্লীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে সন্তোষকুমার দত্ত'র পরিচয় ছিল অনেক আগে থেকেই।

দুই

স্কুল প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে চলল। কিন্তু শুধুই বসবাসের জায়গাটুকু হলেই তো চলবে না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করে তুলতে হবে। তা না হলে সমূহ সর্বনাশ। সন্তোষকুমার দত্ত'র ভাষায় "সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের একমাত্র অবলম্বন তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা। তাঁদেরকে যদি উপযুক্ত করে গড়ে না তোলা যায় তা হলে এই নতুন জায়গায় এসে শুধুই জমি দখল করে বেঁচে থাকা যাবে না।"

অতএব প্রয়োজন শিক্ষা-ব্যবস্থার।

মিলিটারীদের রিক্রিয়েশন সেন্টার, যেটা 'বিজয়গড় হল' নামেই পরিচিত ছিল, সেই হল তখন খালিই পড়েছিল। সেই হলঘরের অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না। চারিদিকে পাকা দেওয়াল ছিল বটে কিন্তু অ্যাসবেস্টসের চালায় ছিল অসংখ্য ফাটল। ফলে বৃষ্টি বাদলে হলঘরের ভিতর জল পড়াটাই ছিল স্বাভাবিক। ঘরের দরজা-জানালাও তখন ভাল ছিল না।

প্রথমদিকে বিজয়গড় ছিল উদ্বাস্তু শিবির। সেই উদ্বাস্তু শিবিরের ছেলেমেয়েদের জন্য সেই হলঘরের ভিতরেই ১৯৪৮ সালে শ্রদ্ধেয়া সন্ধ্যা সেন এবং গৌরী ঘোষ দস্তিদার নামে এই অঞ্চলেরই দুইজন সমাজকর্মীর প্রচেষ্টায় প্রথমে একটি প্রাইমারী স্কুল শুরু করা হয়। পয়সাকড়ির কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না। ছেলেমেয়েদের বসবারও কোন ব্যবস্থা নেই। শুধুই মেঝের উপর বসে কোনরকমে পড়াশুনা চালানো। অসহায় মানুষদের বেঁচে থাকবার এ যেন এক নিদারুণ প্রচেষ্টা।

তৎকালীন নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ৬ই জানুয়ারী এই হলঘরের ভিতরেই একটি হাইস্কুল গড়ে ওঠে। প্রথমে কিছুদিন এই স্কুলটির নাম ছিল "যাদবপুর বাস্তুহারা বাণীপীঠ"। সকালে মেয়েদের স্কুল বসত এবং দুপুরে স্কুল বসত ছেলেদের। এই উভয় বিভাগেরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল দাশগুপ্ত মহাশয়। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন এই স্কুলের সাথে জড়িত ছিলেন না।

পরে ঐ বৎসরেই এই স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে "যাদবপুর বাস্তুহারা

বিদ্যাপীঠ" নামকরণ করা হয়। ঐ হলঘরের ভিতর ঐ একই নামে সকালে মেয়েদের এবং দুপুরে ছেলেদের স্কুল চলতে থাকল।

শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার দত্ত'র সভাপতিত্বে এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় নলিনী মোহন দাশগুপ্তকে সম্পাদক করে একটি স্থায়ী নির্বাচিত স্কুল কমিটির অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল ছেলেদের স্কুলটি।

শ্রদ্ধেয় গোপাললাল চ্যাটার্জী কিছুদিন ছেলেদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ পরিচালনা করেন। এরপর শ্রদ্ধেয় অবিনাশ চক্রবর্তী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে গোপালবাবু সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ চালাতে থাকেন। এঁরা সকলেই ছিলেন এই অঞ্চলের বিশিষ্ট উদ্বাস্তু।

মেয়েদের স্কুল, যেটি সকালে বসত তারও সভাপতি ছিলেন সন্তোষকুমার দত্ত এবং সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় বিজয়কুমার মজুমদার মহাশয়।

অমৃতলাল দাশগুপ্ত মহাশয় অবসর নিলে মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে শ্রদ্ধেয় নিবারণ সেনগুপ্ত মহাশয় নিযুক্ত হন। তিনিও ছিলেন এই অঞ্চলেরই একজন বিশিষ্ট উদ্বাস্তু।

ছেলেদের এবং মেয়েদের স্কুলে সেই সময় যাঁরা শিক্ষকতা করতেন সেই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও ছিলেন এই অঞ্চলেরই উদ্বাস্তু অধিবাসী।

প্রথমদিকে তাঁদের বেতন দেবার মতনও কোন সংস্থান ছিল না স্কুলের। পরবর্তীকালে তাঁদের যে বেতনটুকু দেওয়া হত তাও ছিল খুবই সামান্য। আর এই সামান্য বেতনটুকুও বহু সময়ই দুই বা তিন বারে পরিশোধ করা হত তাঁদের। স্কুল কর্মচারীদের অবস্থাও এর থেকে উন্নত ছিল না।

স্কুলের চালা দিয়ে বর্ষার সময় বহু জায়গায়ই জল পড়ত। এরই ভিতর নিজেদেরকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে পড়াশুনা চলত ছেলেমেয়েদের।

শ্রদ্ধেয় চিত্ত দে'র প্রচেষ্টায় কয়েকটি বেঞ্চ, চার-পাঁচখানা চেয়ার টেবিল এবং কয়েকটি ব্ল্যাক বোর্ড-এর সংস্থান হল স্কুলের। এরই ভিতর কোন প্রকারে স্কুলের কাজ চালিয়ে নিতে লাগলেন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

ক্রমে অবশ্য এই ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। হলঘরের ভিতর মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী করা ক্লাসরুমে বেঞ্চের সংখ্যা বাড়ল কিছুটা। চেয়ার-টেবিলের সংখ্যাও কিছুটা বাড়ানো সম্ভব হল।

স্থানীয় উদ্বাস্তুদের একান্তভাবেই নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রথম গড়ে উঠল দুটি হাই স্কুল। এই স্কুলের পিছনে বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় বিপিনবিহারী চাকী,

বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় সুকুমার চ্যাটার্জী, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় শিশুলাল চ্যাটার্জী এবং আরো অনেকের সহযোগিতাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫০ সালে হলঘরের উল্টোদিকেই অবস্থিত মিলিটারী ব্যারাক মিলিটারীদের অধিকার মুক্ত হলে (যার কথা কলেজ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে), স্কুল দুইটি সাময়িকভাবে ঐ ব্যারাক ঘরে এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় চালাঘর নির্মাণ করে স্থানান্তরিত করা হয়। এটা তখন শুধুই স্কুল নয়, ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবার আরেক সংগ্রাম।

সহায়-সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের পক্ষে তখন নিজেদের খাওয়া পরা কোন প্রকারে চালিয়ে সন্তান-সন্ততিদের পড়াশুনা করাবার খরচ চালাবার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। নলিনীমোহন দাশগুপ্তের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং সন্তোষকুমার দত্ত'র কর্মপ্রচেষ্টা এবং সরকারী মহলে প্রভাব বিস্তারের ফলে প্রতিটি উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি সরকারী সাহায্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং তারই ফলে এই অঞ্চলের ঘরে ঘরে উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের পক্ষে সম্ভব হল পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে চিত্ত দে বলেন যে, এই দুটি স্কুল সেদিন যদি গড়ে না উঠত এবং সন্তোষকুমার দত্ত এবং নলিনীমোহন দাশগুপ্ত তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারী সাহায্য সংগ্রহ করে না আনতেন তা হলে এই অঞ্চলের ঘরে ঘরে এই ভাবে শিক্ষাবিস্তার ঘটা সম্ভব হত না এবং এই অঞ্চলের আজকের এই উন্নত অবস্থাও হয়তো গড়ে উঠতো না।

স্কুল দুইটি মিলিটারী ব্যারাকে এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় উঠে আসবার কিছু পরেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় বালক বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। বালিকা বিভাগের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয়া সুশীলা মণ্ডল মহাশয়া। এঁরা উভয়েই ছিলেন উদ্বাস্তু দরদী, অসম্ভব নিয়মনিষ্ঠ এবং কর্মযোগী।

সুশীলা মণ্ডল ছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরীর ছাত্রী। সুশীলা মণ্ডল-এর বালিকা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর কাছে জানা যায় যে সেই সময় বালিকা বিভাগে একজন প্রধান শিক্ষিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এই বিষয়ে সাহায্য চেয়ে সন্তোষকুমার দত্ত ড. মাখনলাল রায়চৌধুরীর কাছে উপস্থিত হন। ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী ছিলেন সন্তোষকুমার দত্ত'র একজন বিশিষ্ট বন্ধু। ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী সুশীলা মণ্ডলের নাম প্রস্তাব করেন। সুশীলা মণ্ডলের বয়স ছিল অল্প। তিনি প্রধান শিক্ষিকার পদে নিযুক্ত হবার দু'-একদিন পরেই এই মহান দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন কিনা

তাঁর নিজের ভিতরেই এই সন্দেহ দেখা দেয় এবং তিনি স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়ে স্কুল পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুশীলা মণ্ডলের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে সেই সময় একদিন হঠাৎ সন্তোষকুমার দত্ত তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সুশীলা মণ্ডল এবং তাঁর বাবার সাথে তিনি কথা বলেন। সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র ছেলেমেয়েদের হাত ধরে এপারে চলে এসে বাঁচার সংগ্রামে নেমেছে যে মানুষগুলো এবং সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের মানুষ করে গড়ে তুলবার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে যে স্কুল, সেই স্কুল পরিচালনার কাজে সন্তোষকুমার দত্ত একান্তভাবেই তাঁর সাহায্য চাইলে সুশীলা মণ্ডলের পক্ষে সম্ভব হল না তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া। সন্তোষকুমার দত্তকে তিনি নিজের বড় ভাই-এর চাইতেও বেশি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন স্কুলের।

সুশীলা মণ্ডল ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। সন্তোষকুমার দত্ত মানুষ চিনতে ভুল করেননি। তাঁর সময়েই বালিকা বিভাগের প্রভূত উন্নতি হয়। পরবর্তীকালে তিনি মেদিনীপুরে একটি কলেজে প্রিন্সিপাল হয়ে চলে যান। সেও অনেকদিন পরের কথা। সুশীলা মণ্ডল চলে যাবার পর শ্রদ্ধেয়া ফুলরাণী গুহ মহাশয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নিযুক্ত হন।

শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র বিশ্বাসের মৃত্যুর পর বালক বিভাগে শ্রদ্ধেয় প্রেমাংশু সেনগুপ্ত মহাশয় প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি চলে যাবার পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি দীর্ঘদিন স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর কর্মপ্রচেষ্টায় স্কুলটির যথেষ্ট উন্নতি হয়।

স্কুল দুইটি আপন বৈশিষ্ট্যে সমগ্র কলকাতায় একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিতে সমর্থ হয়। বালক বিভাগে ছাত্রসংখ্যা আঠারোশত ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হল। বালিকা বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা প্রায় এক হাজার গিয়ে পৌছলো। সমস্ত ছাত্র ছাত্রীই ছিল এই অঞ্চলের এবং আশপাশ অঞ্চলের উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েরা।

এই স্কুলে সেই সময়ে অসম্ভব দুরবস্থার ভিতরে পড়াশুনা করেও এবং তৎকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বহু ছাত্রছাত্রীই আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছেন এঁরা। এটা অবশ্যই এই স্কুলের গর্ব।

এই অঞ্চলের নাম "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী" থেকে "বিজয়গড়"-এ পরিবর্তিত হবার ফলে "যাদবপুর বাস্তুহারা বিদ্যাপীঠ"-এর নামও পরিবর্তন করে করা হয় "বিজয়গড় বিদ্যাপীঠ" বালক বিভাগ এবং বালিকা বিভাগ।

বিজয়গড় পরিচালক সমিতি যার সভাপতিও ছিলেন সন্তোষকুমার দত্ত, তাঁর নেতৃত্বে আগে থেকেই স্কুল দুইটির জন্য দুইটি জায়গা নির্দিষ্ট করেই রাখা ছিল। কিছুদিন পরে স্কুল দুইটিকে সেই নির্দিষ্ট করা জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং দুইটি স্কুলই তখন দুপুরে চলতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের ভিতরেই ছয়-সাতটি প্রাইমারী স্কুল গড়ে উঠল এই অঞ্চলে। স্কুল মানে মাথার উপর কোন রকমের একটা ছাউনি দিয়ে একটা মাত্র ঘর। এই সকল অধিকাংশ ঘরেই তখন কোন বেড়া ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীদের বসবার মতো কোন ব্যবস্থাও ছিল না তখন।

ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই বাড়ী থেকে ছালার চট কিংবা খবরের কাগজ এনে সেটাকেই বিছিয়ে বসত মেঝের উপর। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসবার মতো কোনরকম ব্যবস্থাও ছিল না সেখানে। বর্ষার সময় বৃষ্টির ছাঁট আসত ঘরে, গ্রীষ্মের দারুণ রৌদ্র উত্তপ্ত করে তুলত ঘরের কোন একদিক। ছাত্র-ছাত্রীরা তখন সেই ঘরের অপেক্ষাকৃত একটু ভাল জায়গা বেছে নিয়ে আবার গিয়ে দল বেঁধে বসত সেখানে। এভাবেই ঘরের বিভিন্ন দিকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে চলত তাদের পঠন-পাঠন।

যে সকল উদ্বাস্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সকল স্কুলগুলির দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এই ভাবেই সেদিন গড়ে উঠছিল উদ্বাস্তু শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হয়ে।

জীবনের কোনরকম কৃত্রিমতা তাঁদের স্পর্শ করেনি সেদিন, নিজেদের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে, মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শুধুই তখন সম্মুখে এগিয়ে চলার মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছিল তাঁদের মনে।

এরপর আরও কিছু কিছু স্কুল এই এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষানুরাগীদের একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন শ্রদ্ধেয় মণি পালের প্রচেষ্টায় "বিজয়গড় শিক্ষানিকেতন", শ্রদ্ধেয় শম্ভু গুহঠাকুরতার প্রচেষ্টায় "বিজয়গড় আদর্শ বিদ্যালয়", শ্রদ্ধেয় সুশীল সেনের প্রচেষ্টায় "বিদ্যার্থী ভবন" ইত্যাদি।

"বিজয়গড় শিক্ষানিকেতন" স্কুলটি গড়ে উঠবার সময় শ্রদ্ধেয় কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিও ছিলেন এই অঞ্চলেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

শুধুই তো স্কুল নয়।

বাঙালী হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা রয়েছে, অথচ সেখানে একটিও ঠাকুরবাড়ী নেই, এমন স্থান সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। ঈশ্বরের প্রতি

বিনম্রচিত্তে ভক্তি জানানো, তাঁকে সকালে সন্ধ্যায় প্রণাম করে চিত্ত শুদ্ধির আবেদন জানানো বাঙালী হিন্দুর চিরাচরিত প্রথা। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

সেই হিন্দু সম্প্রদায় যখন উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসতে বাধ্য হলেন, তাঁরা তাঁদের পুজো-পার্বণের মানসিকতাও নিয়ে আসলেন সঙ্গে করে এবং এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করবার পরেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল ঠাকুরবাড়ী নির্মাণের। কিন্তু ঠাকুরবাড়ী এমন একটি স্থানেই নির্মিত হওয়া প্রয়োজন, যেখানে উপস্থিত হতে এই উদ্বাস্তু কলোনীর সকলের পক্ষেই সুবিধা হবে। এই কারণেই এই অঞ্চলের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের মোটামুটিভাবে একটা কেন্দ্রস্থল বেছে নিয়ে ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনা করছিলেন। বড় রাস্তার পাশেই আট নম্বর ওয়ার্ডে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ঠাকুরবাড়ী। দেশবিভাগের পূর্বে প্রত্যেক হিন্দু অধিবাসীরই নিজস্ব গ্রামে ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিভিন্ন সময়ে পুজো-পার্বণ অনুষ্ঠিত হত সেখানে। দেশত্যাগ করে আসবার মুহূর্তে সেই মন্দির এবং বিগ্রহ সমস্তই ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। স্বজন হারানো ব্যথার মতো সেই স্মৃতির যন্ত্রণার যেন কিছুটা উপশম ঘটল এই ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠার ফলে।

প্রথমে কাঁচা অবস্থায়, পরবর্তীকালে পাকা বাড়ীতে রূপান্তরিত হল ঠাকুরবাড়ী। মন্দির সংলগ্ন চাতালটির উপরেও ছাদ তৈরি হল কালক্রমে। পুজো, সংকীর্তন সব মিলিয়ে অল্পদিনের ভিতরই জম-জমাট হয়ে উঠল ঠাকুরবাড়ী। প্রতিষ্ঠিত হল কালী মূর্তি, শিব বিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মের এক সমন্বয় ঘটল এখানে। এই ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠায় সেই সময় এই অঞ্চলেরই অধিবাসী শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গ দত্ত, রাধেশ্যাম দত্ত এবং আরো অনেকের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

তিন

সমবায় ও উদ্বাস্তু মন্ত্রী এবং রামেশ্বরী দেবীর উদ্বাস্তু পল্লী পরিদর্শন। উদ্বাস্তু পল্লী সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ঘোষণা। উদ্বাস্তু পল্লীতে কৈলাসনাথ কাটজু।

যে সময়ে ফরিদাবাদ আশ্রয় শিবিরের পাঞ্জাব সীমান্তের আশ্রয় প্রার্থীরা দাবি করেন যে, সরকারকে তাদের জন্য পৃথক নগর গড়ে দিতে হবে, সেই সময় পশ্চিমবাংলায় কয়েক সহস্র উদ্বাস্তু স্বীয় কর্মদক্ষতায় নিজেদেরই হাতে গড়া এই নগরে বসবাস করছিলেন। তাঁরা সরকারকে কোনভাবেই বিব্রত করেননি। সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই সরকারের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সাহায্য আশা করেছিলেন মাত্র।

এই উদ্বাস্তু পল্লীর বাতাসে তখন ভাসমান কর্মময় মানুষের নিঃশ্বাস। তা না হলে সামান্য কিছুদিনের ভিতর বিনা হাতিয়ারের সম্বলে এতগুলি মানুষ কোনো প্রকার করুণা-কপর্দকের প্রত্যাশা না করেও এই প্রান্তরের বুকে জীবন সঞ্চার করতে পারত না। বর্ষার জল-কাদায় অনেক কুটীর ধ্বসে গেছে, ভূস্বামীর রক্তচক্ষুর তীব্র কটাক্ষ পল্লীবাসীর মানসিক ও সাহসিক শক্তির উপর আঘাত হেনে পরাভূত করবার ত্রুটি করেনি, ঘর তৈরী করবার মাল-মশলাও সব সময় সহজলভ্য ছিল না।

এই অবস্থায় উদ্বাস্তুরা যখন অন্ধকারে পথের সন্ধান করছেন ঠিক সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সমবায়, ঋণ ও পুনর্বাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিকুঞ্জবিহারী মাইতি মহাশয় একদিন এই উদ্বাস্তু পল্লী পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি বলেন ঃ

"আশ্রয় প্রার্থীদের পানীয় জলের, ঘর মেরামত করবার জিনিসপত্রের, পায়খানার, কর্মের ও শিক্ষার অভাব আছে। নিজেরা তাঁরা এই সকল অভাব মেটাবার চেষ্টা করছেন। এতে আমি আনন্দিত হয়েছি। কারণ এর ভেতরেই জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করার যোগ্যতা অর্জনের বীজ রয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে কূটনীতি আমাদের মধ্যে এই দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে তার স্বরূপ বুঝে মাথা ঠিক রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। বিহ্বল হয়ে পড়লে ভুল করা হবে। এই বিপদকে আমরা ইচ্ছা করলে জাতির সম্পদে পরিণত করতে পারি। ভগবান যেন সেই সুমতি দেন। সরকার থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করবার

চেষ্টা করা হবে, যাতে এঁদের অসুবিধা কিছু পরিমাণে দূর করা যায়, এই কথা আমি বলতে পারি।"

পরিশেষে তিনি খোলামনে উদ্বাস্তুদের মঙ্গল কামনা করে বলেন ঃ

"স্বাবলম্বনের উপদেশ অনেকেই দিতে পারেন, কিন্তু সেই উপদেশটুকু অন্যকে সরবরাহ করার চেয়ে নিজেদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সশ্রদ্ধভাবে যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁরা ধন্যবাদেরই পাত্র।"

মনোরম পরিচ্ছন্ন এই পল্লীর কথা সেই সময় সমগ্র দেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সরকারী ও বেসরকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই পল্লী স্বচক্ষে দেখবার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। তাঁরা যখন এই পল্লী পরিদর্শনে আসেন তখন তাঁরা উপলব্ধি করেন যে এই পল্লী সম্পর্কে তাঁদের যে কল্পনা ছিল সেই কল্পনাকেও অতিক্রম করে গেছে এখানকার বাস্তব চিত্র।

সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার গুহ'র উদ্ধৃতি থেকে এই প্রসঙ্গে জানা যায়, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু একদিন এই পল্লী পরিদর্শন করতে আসেন। এই উদ্বাস্তু পল্লী দেখে খুশী হয়ে তিনি বলেন ঃ

"I was very pleasantly impressed by what I saw in the Jadavpur Colony. It is rare to come across such rare example of self help as I saw here. Houses are cheap, neat and clean. All needs of the people by way of shops, schools, various craft centre etc., has been provided by the society. Members of the society are all educated and highly placed in life. It was surprising that they resorted to tresspass the boundaries of law by building up this colony. But as one of them remarked : perhaps, necessity knows no law and many of them were so hard pressed for accomodation that they had to do what they did. I hope that the whole affair will be regularised by the Government and placed on a sound legal basis."

অনুমান করা যায় যে এই যাদবপুর উদ্বাস্তু পল্লীর অধিকৃত জমি সম্বন্ধেই সেদিন শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু উক্ত আইনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন পর্যন্ত এই জমির মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবেই নিজেদের প্রচেষ্টায়, পরিচালক সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনায় উদ্বাস্তু পল্লীর প্রতিটি ওয়ার্ডে একাধিক নলকূপ, রাস্তা, জলনিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়েছে।

১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন কলকাতায় আসেন তখন সন্তোষকুমার দত্ত'র নেতৃত্বে এই উদ্বাস্তু পল্লীর স্বীকৃতি দাবি করে সমস্ত বিবরণ জানিয়ে পণ্ডিত নেহরুর কাছে একটি স্মারক-লিপি প্রদান করা হয়।

এই স্মারক-লিপি পেয়ে এই উদ্বাস্তু পল্লী সম্বন্ধে অবগত হয়ে পণ্ডিত নেহরু তাঁদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং জনসভায় ঘোষণা করেন ঃ

"I am delighted to learn of the fine work done there and I congratulate them on it."

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর এই সাধুবাদে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার ঘটলো।

১৯৪৯ সালের ১৯শে আগস্ট মধ্যাহ্নে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু মহাশয় যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী পরিদর্শনে আসেন। সাংবাদিক এবং স্থানীয় প্রবীণ অধিবাসী শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার গুহ'র লেখনী থেকে জানতে পারি যে তিনি পদব্রজে পল্লীর প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন এবং পল্লীর অধিবাসী সংখ্যা, শিক্ষায়তন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেন। যাদবপুর উদ্বাস্তু পল্লীর তৎকালীন সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত তাঁকে সব কিছু ঘুরে দেখান এবং বিস্তারিতভাবে সব কিছু বর্ণনা করেন।

চার

এভিক্‌শন বিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাথে সন্তোষকুমার দত্ত'র সাক্ষাৎ।

১৯৫১ সালে Act XVI of 1951 এ "Eviction of Persons in Unauthorized Occupation of Land Bill" অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় "Eviction Bill" জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য গৃহীত হয়।

সে সময় ফাঁকা জমি পেলেই দখল করে নিয়ে নিতান্তই বাঁচার তাগিদে উদ্বাস্তুরা নিজেদের প্রচেষ্টায় চতুর্দিকে বাসস্থান গড়ে তুলছিলেন। এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়াও ছিল এই বিল-এর একটি উদ্দেশ্য।

শ্রদ্ধেয় জননেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা রায়, অনিলচন্দ্র রায়, সৌম্যেন্দ্র [illegible]ঠাকুর, সমর গুহ প্রমুখ নেতৃবর্গের নেতৃত্বে এই "Eviction Bill"-এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫১ সালে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মণি পালের বক্তব্য থেকে জানা যায়, এই কমিটির আহ্বানে মনুমেন্টের পাদদেশে এক বিশাল উদ্বাস্তু সমাবেশ ঘটে। সেদিনের সেই সমাবেশের নেতৃত্বে ছিলেন সন্তোষকুমার দত্ত, জীতেন মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই), শম্ভু গুহঠাকুরতা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এই সমাবেশের গুরুত্ব সেদিন ছিল অপরিসীম। ঘোষিত হ'ল ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকবার সুদৃঢ় অঙ্গীকার। নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব উদ্বুদ্ধ করে তুলল উদ্বাস্তুদের নিজেদের আবাসস্থল নিজেরাই গড়ে তুলবার জন্য, বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে। "Eviction Bill"-এর বিরুদ্ধে উচ্চারিত হ'ল প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদী সভায় বিজয়গড়ের ভূমিকা সেদিন ছিল যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই) এবং মণি পালের বক্তব্য থেকে আরো জানা যায় যে এই "বিল" গৃহীত হবার অনেক আগেই এই অঞ্চল গড়ে উঠবার প্রায় শুরুতেই পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী"-র সভাপতি সন্তোষকুমার দত্তকে উদ্বাস্তু বিষয়ক আলোচনা করবার জন্য একদিন ডেকে পাঠান।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাথে সন্তোষকুমার দত্ত'র পরিচয় ছিল দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতা সংগ্রামী, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের "যুগান্তর" শাখা যেটা "শান্তিসেনা

পরিষদ" নামে বিপ্লবী পূর্ণ দাস কর্তৃক পরিচালিত হত, তার অন্যতম নেতা সন্তোষকুমার দত্ত'র জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে জেলখানার অন্তরালে।

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সামন্ত, ডিরেক্টর, আই. বি. সম্পাদিত Terrorism in Bengal, Vol. 1 গ্রন্থে দেখা যায়, Special Superintendent of I. B., Bengal R.E.A. Ray তাঁর "Report on the Activities of Terrorists in Bengal from April to December 1930" পর্যায়ের রিপোর্টে লিখেছেন ঃ

"In this (ফরিদপুর) district Madaripur is the stronghold of the Jugantar organisation. Santosh Kumar Datta was the leader and his principal workers were Bidhu Mazumdar and Kali Prasad Banarji. Santosh Datta was in touch with the main Jugantar organisation in Calcutta and was organising for outrages in Faridpur district ...... Little information, however, has been received about the party's activities in the Faridpur district, except the vigorous recruiting has been going on. Santosh Datta and the eight other members of the party who had been arrested by the end of December were active for the most part in Calcutta.... Beyond the Mauser pistol mentioned above..... Little information has been received about the arms of this group...."

দেউলী জেলের অভ্যন্তরে একটি সংগ্রাম পরিচালনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন তাঁর "জেলখানা কারাগার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

"আসলে এই সংগ্রামের অধিনায়কত্ব স্বাভাবিক ভাবেই বর্তিয়াছিল শ্রীযুক্ত সতীন সেন ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ দত্ত'র উপর। ইহার কারণও অবশ্য ছিল।

সতীন দা (শ্রীযুক্ত সতীন সেন) তো ছিলেন বহু জেল সংগ্রামেরই অভিজ্ঞতাপুষ্ট শ্রেষ্ঠ সৈনিক, সন্তোষ দা'র উপরেও অতীতের কারা কাহিনী কম লাঞ্ছনার চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।"

ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেই বিরাট পুরুষ সন্তোষকুমার দত্ত'র পরিচিতি ছিল সেই সময়ের বাংলার সমস্ত নেতৃমহলে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৬৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর সন্তোষকুমার দত্ত'র তিরোধানের পর শ্রদ্ধেয় হরিদাস মিত্র এম. এল. এ. মহাশয়ের, যিনি এই অঞ্চলের বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন দীর্ঘদিন, লেখা একটি চিঠি এখানে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি লিখলেন ঃ

"পরম শ্রদ্ধেয় সন্তোষ দত্ত'র মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বড় ব্যথিত হলাম। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক গোলযোগের কিছু পরে তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল, দেখলাম নিপীড়িত মানুষের সেবার জন্য অসুস্থ শরীরেও তাঁর কি ব্যাকুলতা। দুঃসহ অত্যাচারকে বন্ধ করবার জন্য পথ সন্ধানে কি আকুল আগ্রহ।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈপ্লবিক পুরোধা হিসাবে একটানা বারো তেরো বছরের দীর্ঘ কারাবাসের পরও তাঁর অসীম সাহস ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। নব উদ্যমে দিকে দিকে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করেছেন।

দেশ ভাগের পর লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের দুয়ারে তিনি এসে দীপ্ত করাঘাত হেনেছিলেন। দিশাহারা মানুষকে উত্তিষ্ঠত জাগ্রতের বাণী শুনিয়ে দৃপ্ত তেজে পশ্চিমবাংলায় সর্বপ্রথম উপনিবেশের জয়ধ্বজা উড্ডীন করেছিলেন। তাই গড়ে উঠল বিজয় বার্তা নিয়ে "বিজয়গড়"। তিনি যদি এসে সেদিন শক্তিমানের নেতৃত্ব না দিতেন সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝাকে একান্তে গ্রহণ না করতেন, জানিনা বাংলার মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু সমাজ বাঁচবার এক নবমন্ত্রে দীক্ষিত হত কিনা?

বীরের মহাপ্রয়াণে শোকাশ্রু নয়; তাঁর আদর্শ, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা, তাঁর স্মৃতি চির জাগরুক থাক, বিজয়গড়ের অংশ বিশেষ হোক সন্তোষগড়।......"

সন্তোষ কুমার দত্ত'র তিরোধানের খবর পেয়ে শ্রম এবং প্রচার দপ্তরের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় বিজয় সিং নাহার মহাশয়ও ১৯৬৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে লিখলেন ঃ

".......আমাদের পরম বন্ধু, সন্তোষকুমার দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণের সংবাদে ব্যথিত হইলাম। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইনি ছিলেন একজন অগ্রণী সৈনিক এবং সমাজ সেবার বিভিন্ন কাজে সব সময়েই আত্মনিয়োগ করিতেন......."

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও সন্তোষকুমার দত্তকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে অনেক আগে থেকেই জানতেন।

১৯৪২ সালের বিখ্যাত "ইংরেজ ভারত ছাড়" আন্দোলনের পরবর্তী দিনগুলিতে তেমন বড় ধরনের আর কোন গণ আন্দোলন ভারতবর্ষে সংগঠিত হয়নি। যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির মতো সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলির উপর্যুপরি আক্রমণ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী তীব্র অহিংস আন্দোলন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদহিন্দ বাহিনী কর্তৃক ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, নৌ-বিদ্রোহ—এই সমস্ত ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। তখন ছিল শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

BIJOY SINGH NAHAR
MINISTER-IN-CHARGE
LABOUR AND PUBLICITY
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRITERS' BUILDINGS
CALCUTTA

বিজয় সিংহ নাহার
শ্রম ও প্রচার মন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস
কলিকাতা।

No. 1193/LMIN

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪

প্রিয়বরেষু

আপনার পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃদেব, আমাদের পরমবন্ধু, সন্তোষ কুমার দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণের সংবাদে ব্যথিত হইলাম। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী সৈনিক এবং সমাজসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সব সময়েই আত্মনিয়োগ করিতেন। আপনাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি

ভবদীয়
বিজয় সিংহ নাহার

শ্রীদেবব্রত দত্ত
শ্রী সুব্রত দত্ত,
৯/১৯২ বিজয়গড়,
যাদবপুর
কলিকাতা-৩২

স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলিতেও, কারামুক্তির ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করে সন্তোষকুমার দত্ত হোমিওপ্যাথি কলেজ থেকে স-সম্মানে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪২ সালের পরে শেষবারের মতো কারামুক্তির পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একান্ত পরামর্শেই তিনি কিছু দিনের জন্য লক্ষ্ণৌ চলে যান ডাক্তারী করতে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বান পেয়ে সন্তোষকুমার দত্ত সেই সময়ের "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী-র" সাধারণ সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই)-কে সাথে নিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাথে দেখা করতে তাঁর বাড়ীতে যান।

এর পরের ঘটনা ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই) যেমন বিবৃত করেছিলেন তার থেকে জানা যায় যে দু-এক কথার পরেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁদেরকে যাদবপুর এলাকা ছেড়ে "নাকতলা" গিয়ে বসতি স্থাপনের প্রস্তাব দেন। 'নাকতলা'য় তখনও প্রচুর খালি জায়গা পড়ে ছিল। কিন্তু সন্তোষকুমার দত্ত এবং 'কালাভাই' উভয়েই এই প্রস্তাব মেনে নিতে অসম্মত হন। তাঁদের যুক্তি ছিল, তখনও বহু উদ্বাস্তু যাঁদের কোন আশ্রয় স্থান জোটেনি এবং তখনও যাঁরা চলে আসছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক নাকতলায়। 'যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী'তে যাঁরা তখন তাঁদের শেষ কপর্দক দিয়ে কোন রকমে আচ্ছাদন তৈরী করে বসবাস করতে শুরু করেছেন তাঁদেরকে নতুন করে আর উদ্বাস্তু করা সম্ভব নয়।

এই কথা স্বাভাবিক ভাবেই বিধান রায়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাল। তিনি "ফোর্স" পাঠিয়ে ইচ্ছে করলেই একদিনের ভিতর এই এলাকাকে উদ্বাস্তু মুক্ত করে দেওয়া যায় বলে ধমক দিয়ে উঠলেন।

এর পরের ঘটনা 'কালাভাই'-এর মুখেই শোনা যাক, "সন্তোষদা এতক্ষণ বসেছিলেন। বিধান রায়ের কথা শুনে হঠাৎ তিনি তাঁর বিরাট দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। বললেন, 'ডাঃ রায়, সমস্ত শিরা উপশিরার রক্ত ব্যয় হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং তারই বিনিময়ে আজ আপনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী।' যারা নিজেদের দোষে নয়, রাজনৈতিক কারণে দেশ ভাগের ফলে আজ উদ্বাস্তু, তারা সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় সরকারকে কোনরকম বিব্রত না করে নিজেদের আশ্রয়স্থল নিজেরাই করে নিচ্ছে, তাদের আপনি "ফোর্স"-এর ভয় দেখাচ্ছেন? পাঠিয়ে দেবেন আপনার "ফোর্স"। আমাকে আগে হত্যা না করে তারা একটি পরিবারকেও ওঠাতে পারবে না সেখান থেকে।"

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চুপ করে বসে থাকলেন। কালাভাই'র ভাষায়, "সন্তোষদার চোখ মুখের ভাব থমথমে। যেন আসন্ন কোন ঝড়কে সামলাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।"

শ্রদ্ধেয় সুরেশ মজুমদার তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। তিনি একদিন সন্তোষকুমার দত্তকে পত্রিকা অফিসে ডেকে পাঠালেন। সেখানে সুরেশ মজুমদার, সাংবাদিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সন্তোষকুমার দত্ত তাঁর অতীত বিপ্লবী জীবনের কারণেই এঁদের সাথেও আগে থাকতেই পরিচিত ছিলেন। তিনি উপস্থিত হবার কিছুক্ষণ পরেই কালাভাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন।

এর পর কালাভাই যেমন বিবৃত করেছেন, "সুরেশ মজুমদার বিধান রায়ের প্রস্তাব মেনে নেবার জন্য সন্তোষকুমার দত্তকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সন্তোষকুমার দত্ত তাঁর নিজের যুক্তিতে দৃঢ় হয়ে থাকবার ফলে আলোচনা ভেঙে যায়।"

অনুমান করা যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একান্ত অনুরোধেই সুরেশ মজুমদার সেদিন সন্তোষকুমার দত্তকে আলোচনার জন্য তাঁর পত্রিকা অফিসে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সন্তোষকুমার দত্ত'র চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সুতরাং নব্য গঠিত এই উদ্বাস্তু অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করবার জন্য "ফোর্স" পাঠালে সন্তোষকুমার দত্ত যে তাঁর অঙ্গীকার পালনে একটুও পিছপা হবেন না এই অনুমান তিনি যথার্থভাবেই করেছিলেন। সেই কারণেই, সুরেশ মজুমদার এবং চপলাকান্ত ভট্টাচার্য'র মাধ্যমে সন্তোষকুমার দত্ত-কে তিনি কোন প্রকারে বুঝিয়ে তাঁর দেওয়া প্রস্তাবে সেদিন রাজী করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত মণি পাল এবং শম্ভু গুহঠাকুরতার বক্তব্য থেকেও এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এরপর অবশ্য এ নিয়ে আর আলোচনা অগ্রসর হয়নি। সন্তোষকুমার দত্ত'র বক্তব্যের গুরুত্ব এবং যৌক্তিকতা অনুধাবন করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও "ফোর্স" পাঠাননি উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করে দিতে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহানুভূতি এবং মহানুভবতাই সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল এই ঘটনার ভিতর দিয়ে।

কালাভাই এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে সেদিন যদি সন্তোষকুমার দত্ত ঐ রকম বলিষ্ঠভাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার সাহস না দেখাতেন এবং এই উদ্বাস্তু অঞ্চলকে গড়ে তুলবার জন্য দৃঢ়চিত্ত না হতেন তা'হলে এই বিস্তৃত উদ্বাস্তু অঞ্চল গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা হয়তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

পাঁচ

জাগরণীর প্রতিষ্ঠা। পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা। উদ্বাস্তু পল্লীর নাম পরিবর্তন করে 'বিজয়গড়' নামকরণ। টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটিতে বিজয়গড়ের অন্তর্ভুক্তি।

এই এলাকায় জন বসতি গড়ে উঠবার প্রায় শুরুতেই ১৯৪৮ সালে এই এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুব প্রতিষ্ঠান "জাগরণী"র প্রতিষ্ঠা হয়। বিজয়গড়ের সৃষ্টি লগ্নে জাগরণীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে আরো অনেক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এই অঞ্চলে।

দুই নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার উপর বাজারের আগে, এখন যেখানে 'অগ্রগামী' ক্লাব রয়েছে তার পাশেই মিলিটারীদের পরিত্যক্ত একটি কাঠের ঘর ছিল। সেটিকেই কোন প্রকারে সারিয়ে নিয়ে আনুমানিক ১৯৪৯ সালে একটি পোস্ট অফিসের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু যেহেতু এই পোস্ট অফিসটি আরকপুর মৌজার অধীনে ছিল সেহেতু এই পোস্ট অফিসটির নামকরণ হয় "আরকপুর পোস্ট অফিস"।

১৯৫১ সালে যাদবপুর রিফিউজি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এসোসিয়েশনের তৎকালীন যুগ্ম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ পাল পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে 10/ 1951,/E/K. নম্বর সংবলিত একটি চিঠি লিখে এই পোস্ট অফিসের নাম বদল করে 'বিজয়গড় পোস্ট অফিস' নাম করবার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি লেখেন ঃ

" ....our colony was started in 1948 by the people who had to leave East Pakistan on account of communal disturbance. Gradually it became one of the best colonies drawing attention and appreciation from the Premier of India and the State Government of West Bengal. On our prayer your department has sanctioned a post office in our colony and it has been working here fairly with hope of future progress. The post office is named as Arakpur Post office as the office is situated in Arakpur Mouja. The West Bengal Government has finished preliminary survey of our colony, intent to regularise it as early as possible. In the meantime we have started here 4 high schools

Letter no 10/1951
2K..

From Sree Nagendranath Paul Advocate
Joint Secretary,
Jadabpur Refugee Association
Vijoygarh, Calcutta 1.

To
The Postmaster, General
West Bengal.

Sir,

Our Colony was started in 1948 by the people who had to leave East Pakistan on account of communal disturbance. Gradually it became one of the best colonies drawing attention and appreciation of the from the Premier of India & the Statesmen Government of West Bengal. On our Prayer your department has sanctioned a Post Office in our Colony and it has been working here fairly with hope of future Progress. The Post Office is named as Arakpur Post Office as the office is situated in Arakpur mouza. The West Bengal Government has finished Preliminary Survey of our Colony with intent to regularise it as early as possible. In the meantime we have started here 4 High Schools and a College for the education of the people in Jadabpur area

The people of our Colony desires that the name of the Post Office should be changed and it should be named as "Vijoygarh" Post Office as our Colony is known as such

I hope you will kindly look to the matter and change the name of the Post Office according to our Prayer.

Yours faithfully
Nagendranath Paul
Jt Secretary,
Jadabpur Refugee Associat

and a college for the education of the people in Jadavpur area.

The people of our colony desires that the name of the Post Office should be changed and it should be named as "Vijaygarh" post office as our colony is known as such......"

কাজেই অনুমান করা যায়, এর পূর্বেই "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী"র নেতৃবৃন্দ কোন এক সভায় মিলিত হয়ে এই পল্লীর নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এর পিছনে একটা কারণ ছিল। যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীকে কেন্দ্র করে এবং যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীর তৎকালীন নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তখন যাদবপুর অঞ্চলে আরো বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু উপনিবেশ ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল। ফলে সর্বপ্রথম গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু উপনিবেশ "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীর" নাম পরিবর্তন করাও তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

শ্রীযুক্ত মণি পাল-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে সেই সভায় এই পল্লীর নতুন নামকরণের জন্য অনেক নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী শম্ভু গুহঠাকুরতার প্রস্তাব নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেন এবং এই পল্লীর নতুন নামকরণ হয় "বিজয়গড়"।

আসলে বিজয় করে নিয়ে ঠিক দুর্গের মতন করেই স্বয়ং সম্পূর্ণ এলাকা হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছিল এই এলাকাকে। তাই এর নাম "বিজয়গড়"।

স্বাধীন ভারতবর্ষে জমি দখল করে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম তৈরী উদ্বাস্তু উপনিবেশ হিসাবে "বিজয়গড়" সুপরিচিত।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তাঁর "The Marginal Men" গ্রন্থটিতে The Establishment of the Squatters Colonies অধ্যায়ে বলেছেন ঃ

".........The first such colony which was founded in the southern suburb of Calcutta was aptly named Vijaygarh. The leadership was provided by Santosh Datta, a veteran freedom fighter and Dhirendranath Roy Chowdhury. The military barracks constructed at Jadavpur on land acquired by the Government were now deserted. Numerous refugee families rallied under the leadership of Santosh Datta. They occupied these barracks and within a very short time a colony of refugees sprang up there......."

শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর বিখ্যাত "উদ্বাস্তু" গ্রন্থে বিজয়গড়ের সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন ঃ

".......কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে সবার প্রথম যে উপনিবেশ উদ্বাস্তু

পরিবারদের নিজেদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল তা হল বিজয়গড় কলোনী। তার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার ইতিহাস কিছু স্বতন্ত্র। সরকারের হুকুমে দখল করা জমিতে সৈন্যদের জন্য যে ছাউনি গড়ে উঠেছিল, যুদ্ধ সমাপ্তির পর সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। তারপর শ্রীসন্তোষ দত্তের নেতৃত্বে এই পরিবারগুলি এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করবার কথা সরকারের নিকট উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবের সম্মতি সূচক ইঙ্গিত যে তারা কর্তৃপক্ষের নিকট পেয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়.....তাদের কর্মোদ্যম এবং সংগঠন শক্তি ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই কলোনীটির স্থায়ী রূপ দিয়ে অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।"

কিন্তু অঞ্চল শুধু গড়ে তুললেই তো হবে না! জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার এই সমস্তই যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। পাকা রাস্তার দুই পাশেই মিলিটারীদের দ্বারা প্রস্তুত করা চওড়া কাঁচা ড্রেন ছিল বটে, কিন্তু বেশি বৃষ্টিতে মাঝে মাঝেই জল জমে যেত। নিজেদেরই সেই ড্রেন পরিষ্কারের কাজে নামতে হ'ত তখন। রাস্তাঘাটেরও কোন পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা ছিল না। মনে হয়, ১৯৫০ সালের কোন এক সময় এই অঞ্চলের তৎকালীন সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত এই অঞ্চলকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গড়ে তুলবার তাগিদেই এই অঞ্চলকে মিউনিসি-পালিটির অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য প্রমথনাথ মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ করেন।

সেই সময় টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ মিত্র। তিনি এই উদ্বাস্তু পল্লীকে টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য ১৯৫০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে একটি চিঠির মাধ্যমে তৎকালীন কমিটির কাছে প্রস্তাব পাঠান। তার উত্তরে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী 1/E-C 1951 নম্বর সংবলিত চিঠিতে যাদবপুর রিফিউজি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তৎকালীন সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত প্রমথ মিত্র-কে জানালেন ঃ

"Dear Sir,

I am glad to inform you that your proposal for taking our colony under your municipal administration has been thankfully accepted in our last general meeting......."

উদ্দেশ্য ছিল একটাই, মিউনিসিপালিটির মাধ্যমে এই এলাকার পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করে গড়ে তোলা। এই এলাকাকে স্বাস্থ্যসম্মত বাসোপযোগী করে গড়ে তুলবার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টা তো ছিলই কিন্তু মিউনিসিপালিটির অধীনে এই কাজটিকে আরো সুষ্ঠু ভাবে করাবার জন্যই তাঁরা আগ্রহ বোধ করেছিলেন সেদিন।

এই চিঠির মাধ্যমে সম্মতি জানিয়ে দেবার পর বিজয়গড়কে টালিগঞ্জ

মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তৎকালীন স্থানীয় উদ্বাস্তু অধিবাসীবৃন্দ এবং টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটির যৌথ উদ্যোগে তারপর থেকেই শুরু হয়ে যায় এই উদ্বাস্তু অঞ্চলের জল নিষ্কাশন এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার প্রচেষ্টা।

আসলে, এই উন্মুক্ত প্রান্তরে জনবসতি গড়ে তুলবার সাথে সাথেই সেই সকল অসহায় উদ্বাস্তুদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখাও সেদিন অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন এই উদ্বাস্তু অঞ্চলের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ। অপরিচ্ছন্ন অবস্থার কথা চিন্তা করে সেদিন সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে না গিয়ে, তৎকালীন নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিজেদের আবাসস্থল নিজেরাই গড়ে তুলবার নিদারুণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন যাঁরা, তাঁরা সেদিন এই অঞ্চলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে নিজেদের বাসোপযোগী করে গড়ে তুলবার জন্যও সচেষ্ট ছিলেন সন্দেহ নেই। বিজয়গড় তখন একটি আদর্শ উদ্বাস্তু উপনিবেশ হিসাবেই গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

পরবর্তীকালে এই অঞ্চলকে কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

ছয়

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা। প্রসূতি সদন প্রতিষ্ঠা। বাজার প্রতিষ্ঠা। ইলেক্‌শন কমিশনারের নিকট প্রস্তাব। কমলাকান্তর উদ্বাস্তু পল্লী দর্শন। উদ্বাস্তু পল্লী পরিদর্শনান্তে বিভিন্ন সাংবাদিকের প্রতিবেদন। বিজয়গড়ে ডাঃ আর. আহমেদ এবং বিজয়গড় কনজিউমার্স স্টোর্স।

এদিকে পোস্ট অফিসটি কিছুদিন মিলিটারীদের পরিত্যক্ত কাঠের ঘরে থাকবার পর এই অঞ্চলেরই সাত নম্বর ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সেই কাঠের ঘরের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত হল এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের জন্য প্রথম একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। ডাঃ অপর্ণাচরণ দত্ত এবং ডাঃ ভূপেন্দ্রকুমার গোস্বামী মহাশয়দ্বয় এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রবোধ ঘটক মহাশয়। এঁরা সকলেই ছিলেন এই অঞ্চলেরই উদ্বাস্তু অধিবাসী। সেই সময় এই অঞ্চলের অনেক অসুস্থ, এমনকি গর্ভবতী মায়েদেরও যতটা সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে। সামান্য মাত্র ওষুধপত্র, সামান্য ব্যবস্থা, সেটুকু সম্বল করেই সেদিন এই উদ্বাস্তু অঞ্চলের অসুস্থ মানুষদের যতখানি সম্ভব সেবা করবার কি নিদারুণ প্রচেষ্টা!

১৯৫১ সালের শেষ দিকে মিলিটারীদের ওয়ারলেস অফিসটি মিলিটারীদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হলে ১৯৫২ সালে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় উক্ত ওয়ারলেস অফিসে এই উদ্বাস্তু পল্লীরই বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ অপর্ণাচরণ দত্ত'র নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় এবং নেতৃত্বে গড়ে উঠল প্রসূতি সদন। উদ্বাস্তুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং একান্তভাবেই উদ্বাস্তুদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম প্রসূতি সদন।

এই উদ্বাস্তু পল্লীরই অধিবাসী শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী দত্ত এবং পরে চাঁদপুর সম্মিলনীর পক্ষ থেকে প্রসূতি সদনের জন্য কয়েকটি শয্যা পাওয়া গেল। এই অঞ্চলের আশপাশে কোন প্রসূতি সদন ছিল না তখন। প্রসূতি মায়েদের অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও কিছু সেবা, বিনা পারিশ্রমিকে কিছু সাহায্য, এই ছিল সেদিন এই প্রসূতি সদন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

নতুন গড়ে ওঠা এই উদ্বাস্তু পল্লীর প্রসূতি মায়েদের দুরবস্থা সেই সময় ছিল অবর্ণনীয়। প্রকৃতি তার নিয়ম মেনেই চলে। মৃত্যু যেমন রয়েছে, তেমনি জন্মও তো অবধারিত অথচ কাছে কোন হাসপাতালের অস্তিত্বই ছিল না তখন। বর্তমান বাঙ্গুর হাসপাতালও তখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হাসপাতাল বলতে অনেক দূরে কলকাতার ভিতর অবস্থিত বড় বড় কয়েকটি হাসপাতাল। এই অঞ্চল ছিল তখন চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত। হঠাৎ প্রয়োজনে সেই সকল হাসপাতালে যাতায়াত করাই ছিল দুঃসাধ্য। যানবাহনের তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই। স্থানীয় উদ্বাস্তু অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থাও ছিল তখন নিতান্তই দিন চালানো গোছের। এ ভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে গেলেই যে সেখানে সহজে স্থান পাওয়া যাবে এমনও নিশ্চয়তা ছিল না কোন। অথচ বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো অসহায় উদ্বাস্তু মানুষদের ঢল নেমেছে তখন এই অঞ্চলে। কিন্তু বিপদ যত ভীষণই হোক না কেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে তাকে মোকাবিলা করবার মানসিকতাই হচ্ছে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এই চারিত্রিক দৃঢ়তার ফলেই এই অঞ্চলের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায়, ডাঃ অপর্ণাচরণ দত্ত'র নেতৃত্বে এবং তাঁর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় সেদিন প্রতিষ্ঠিত হল এই প্রসূতি সদন এবং দাতব্য চিকিৎসালয়, পরিপূর্ণ ভাবে সেদিনের সেই সকল অসহায় মানুষদের প্রতি সেবার মনোভাব নিয়েই। সেদিনের প্রসূতি মায়েদের একমাত্র ভরসাস্থল।

সংগ্রহ করা কয়েকটি মাত্র শয্যা, সামান্য কিছু উপকরণ। এইটুকু অবলম্বন করেই কি দারুণ সেবার মনোভাব নিয়ে এই উদ্বাস্তু অঞ্চলের অসংখ্য প্রসূতি মায়েদের সেদিন সেবা করে গেছে এই প্রসূতি সদন, আজ ভাবলেও অবাক হতে হয়।

ডাঃ ভূপেন্দ্রকুমার গোস্বামী এবং ডাঃ নরেন চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়ও কিছুদিন পরে বিজয়গড় প্রসূতি সদনের সাথে যুক্ত হন। এঁরা ছিলেন এই উদ্বাস্তু অঞ্চলেরই অধিবাসী। যদিও প্রসূতি সদনের মূল দায়িত্বের কাজ ডাঃ অপর্ণাচরণ দত্ত মহাশয়ই চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রসব-কাজে অভ্যস্ত স্থানীয় কয়েকজন উদ্বাস্তু মহিলারাই এই প্রসূতি সদনে এগিয়ে এলেন প্রসব কাজে সাহায্য করতে। ডাঃ অপর্ণাচরণ দত্ত'র নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় ক্রমে সার্থক হয়ে উঠল বিজয়গড় প্রসূতি সদন।

আসলে, যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী, তিনি সেই বিষয় নিয়েই সেদিন এগিয়ে এসেছেন সেদিনকার সেই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সমাজকে গড়ে তুলতে। সকলের সাথে একাত্ম হয়ে সেবামূলক কোন কিছু গড়ে তুলবার মহামন্ত্রে যেন দীক্ষিত হয়ে

উঠেছিলেন সকলে। আর এই দীক্ষিত হয়ে উঠবার ফলশ্রুতি এই "বিজয়গড়"।

ঘরটি পাকা ছিল। ফলে সেখানে আরো কিছু শয্যা বাড়িয়ে ঘরটিকে ক্রমে প্রসূতি মায়েদের আরো বেশি সেবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হল। বর্তমানে এটাই বিজয়গড় হাসপাতাল নামে পরিচিত।

যখন এই অঞ্চল গড়ে ওঠে তখন এই অঞ্চলের আশপাশে কোন দোকান বা বাজার ছিল না। যাদবপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে কিছু দোকান এবং বাজার ছিল বটে কিন্তু সেটা এই উদ্বাস্তু পল্লী থেকে বেশ কিছুটা দূর হয়ে যেত। এ ভিন্ন এই উদ্বাস্তু পল্লী প্রতিষ্ঠিত হবার সময় যে সকল উদ্বাস্তুরা এখানে এসে আবাস গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের ভিতর কিছু ব্যবসায়ীও ছিলেন। ফলে ১৯৪৮ সালে পাকা রাস্তার পাশেই যোগান এবং চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে উঠল উদ্বাস্তু পল্লীর প্রথম বাজার। প্রথমে সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়েই বাজার শুরু হল। পরবর্তী কালে এই বাজারকে কেন্দ্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠল এই এলাকায়।

আবাসস্থল গড়ে উঠবার সাথে সাথে এমনি করে ব্যবসা-বাণিজ্যও ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করল বিজয়গড়ে। বেঁচে থাকবার এবং সন্তান-সন্ততিদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শুরু হল এক তীব্র লড়াই। একদিকে সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের দারুণ দৈন্যতা, অপরদিকে বেঁচে থাকবার প্রচণ্ড আগ্রহ। জীবনী শক্তির প্রাচুর্যই সেদিন সাহায্য করেছিল উদ্বাস্তুদের ভাগ্যকে জয় করে নিতে।

কিন্তু শুধু ভাগ্যকে জয় করে নিলেই তো হবে না। সপ্ত পুরুষ যেখানে মানুষ সে মাটি বিসর্জন দিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা যে ভারতবর্ষে, সেই ভারতবর্ষের বৈধ নাগরিকত্বও একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী একমাত্র ভারতভূমির নাগরিকদেরই রয়েছে ভারতবর্ষের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার। অতএব ভোটার লিস্টে এই সকল উদ্বাস্তুদেরও নাম থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১৯৫১ সালের ৭ই মে 8/1951-E/C নম্বর সংবলিত চিঠিতে তৎকালীন ইলেকশন কমিশনার শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয়ের কাছে এই পল্লীর উদ্বাস্তুদের ভোটার লিস্টে নাম তুলবার জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

ইলেকশন কমিশন এই অঞ্চলের তৎকালীন অনুরোধ নেতৃবৃন্দের রক্ষা করে এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের নাম ভোটার লিস্টে ওঠাবার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে এই অঞ্চলের বসবাসকারী অসহায় উদ্বাস্তুদের ভারতভূমির নাগরিকত্ব সুদৃঢ় হল।

১৯৫১ সালে একদিন তৎকালীন নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী

Letter no 8/1951.
E/C.

To
Sree Sukumar Sen I.P.S
Election Commissioner,
New Delhi.

Dear Sir,

We the undersigned beg to draw your immediate attention to the following facts & circumstances for favourable consideration and quick action.

In Jadabpur area, Calcutta, many refugee colonies have come into existence owing to influx of people coming from East Pakisthan on account of communal disturbance & apprehension thereof. Though many of these people are citizens of India according to law & eligible to be recorded as voters, bulk of them have been criminally neglected to be so recorded in the electorale roll.

Under the circumstances, thousands of applications have been filed before the Revising Authority (2nd Munsif Court, Alipore) at Alipore for recording the names of the applicants as voters. But as Ration card is being taken as a main criterion for proving the stay of 6 months ending in December 1949, hundreds of bonafide applications have been rejected as original ration cards have been changed for new ones and in some cases the dates of the transfer are not discernible. Our prayer of inclusion of form no IV has unfortunately rejected with the result that many thousand people of our area shall have no right to exercise their votes in the coming election. Moreover, the certificate issued by a Special Officer, Andaman Rehabilitation department who happens to be the residential President of Jadabpur Refugee Colony has been refused for consideration by the Revising authority at Alipore. Again in non-ration area the refugee applicants can only produce Refugee certificate or citizen certificates but the history of stay of 6 months in the area upto 1949 December 1949 can only be proved by other evidence. But certificates

মহাশয় বিজয়গড় পরিদর্শন করতে আসলেন। তিনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। বিজয়গড় পরিদর্শন করে ১৯৫১ সালের ২৬শে আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় "কমলাকান্তের আসর"-এ "উদ্বাস্তু পল্লীতে কমলাকান্ত"-এ এই শিরোনামায় শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী লিখলেন ঃ

"কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি উদ্বাস্তু পল্লীতে কমলাকান্ত বেড়াইতে গিয়াছিল। ইতঃপূর্বে সে কখনো উদ্বাস্তু পল্লী পরিদর্শন করিবার সুযোগ পায় নাই। এই সব নূতন জনপদ সম্বন্ধে অনেক কথাই তাহার কানে আসিয়াছে বটে, তবে সে সব ছিল শোনা কথা। এবারে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিল। এই পরিচয়ের ফলে কমলাকান্ত যেমন আনন্দ ও বল লাভ করিল, তেমন অনেকদিন করে নাই।

প্রথমেই তাহার মনে হইল যে, হাতের কাছেই, ঘরের পাশেই মানুষের কি অভাবিত গৌরবময় রূপ অবস্থিত, আর মানুষ কিনা তাহার দর্শন লাভের আশায় ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া মরে। নতুবা চার বৎসর পূর্বে যেখানে শূন্য মাঠ আর জলাভূমি ছিল সেখানে বিশ হাজার নরনারীর এই পল্লী গড়িয়া উঠিল কোন আলাদিনের প্রদীপের জাদুমন্ত্রে?.....

......পল্লীটির কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি কমলাকান্ত ও তাহার সঙ্গীদের লইয়া সব দেখাইতে লাগিলেন, যথোচিত পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলেন। আর কেমন করিয়া মাত্র চারটি বৎসরের মধ্যে এসব সম্ভব হইল তাহার বর্ণনা করিয়া শোনাইতে লাগিলেন।

কমলাকান্ত ভাবিল, এই সব যাহারা সম্ভব করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব কি, তাহাদের অসাধ্য কি!....."

বিজয়গড় কলোনীর অধিবাসীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি বৎসর নিয়মিত সাধারণতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং নেতাজী ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব বিশেষ শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সাথে পালন করে এসেছেন। এই সকল উৎসব উপলক্ষে বহু প্রবীণ বিপ্লবী ও দেশ নায়ক এবং সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটেছে এই অঞ্চলে।

এই সকল অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক বিশিষ্ট জন পরিদর্শন করে গেছেন এই অঞ্চল এবং ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন এই অঞ্চলের। সেই সময় এই উদ্বাস্তু অঞ্চল যাঁরা দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুলছিলেন, সেই সকল নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক শক্তি এবং কর্ম-কুশলতা তাঁদের সকলকে মুগ্ধ করে তুলেছিল সন্দেহ নেই।

Statesman পত্রিকার প্রতিনিধি এই উদ্বাস্তু পল্লী পরিদর্শন করে ১৯৫১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর "Refugees who built a model town" শিরোনামায় Statesman পত্রিকায় লিখলেনঃ

"Nearly 100,000 East Bengal refugees live today in some 25 sqatters' settlements that have grown up over a compact area of two square miles to the East and the South-East of the Tollygunge Golf Course (24 Parganas) during the past few years.

The first and largest of these, proudly named Bijaygarh ("Fort of victory"), by its inhabitants, stands in the central part of the area and occupies what during the war was an important signals station.

It started on a modest scale early in 1948 with a small group of refugees who, baffled in their attempts to find shelter elsewhere, squatted in the barracks of the abandoned signals station. Gradually others joined them and overflowing into the open spaces around, built houses on the 300 bighas of land most of which had been requisitioned for the station by the Government of India."

তিনি আরও উল্লেখ করেনঃ

"Today the Settlement, with a population of over 20,000 in 1,800 households, serves as a source of inspiration and encouragement to neighbouring colonies. In its achievements it is perhaps unique in West Bengal : it boasts a second grade college, three high schools (including one for girls), nine primary schools, a maternity home, a charitable dispensary, a large bazar........"

এরপর তিনি আরও উল্লেখ করলেনঃ

"The refugees take justifiable pride in the fact that they have succeeded in building the settlement entirely from their own resources, contending with great legal and other odds. A model in self-help and co-operative effort, it has earned the praise of the Prime Minister, Mr. Nehru, who in July, 1949, remarked : I am delighted to learn of the fine work being done there......."

শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক, এই অঞ্চলেরই প্রবীণ উদ্বাস্তু অধিবাসী প্রফুল্লকুমার গুহ ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকায় "বিজয়গড়-যাদবপুর

বাস্তুহারা পল্লী" শিরোনামায় এই অঞ্চল সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখলেনঃ

"যাদবপুর ও টালিগঞ্জ রিজেন্ট পার্কের মধ্যবর্তী যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীটি (বর্তমান নাম বিজয়গড়) পূর্ববঙ্গ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের কাছে এক বিপুল বিস্ময় ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের নির্দেশক। হঠাৎ বাইরে থেকে গেলে মনে হবে, নব-গঠিত কোন নগরের মধ্যে এসে পড়েছি। বাস্তুহারাদের একটি সাময়িক আবাসভূমি বলে একে মনে করলে ভুল করা হবে। যাঁরা নিজেদের বাঁচবার প্রয়োজনে সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজেদের অর্থে ও পরিশ্রমে তিলে তিলে এই নগর গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা কখনো মনে মনে একে সাময়িক আবাসভূমি বলে মনে করেননি। ভবিষ্যতে এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করবার আগ্রহ নিয়েই এঁরা ঘর তৈরী করেছেন। একটি প্রশস্ত পাকা বড় রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় চারিশত বিঘা জমির উপর অবস্থিত টিন, টালি, বাঁশ, ও কাঠের তৈরী কুটীরগুলি পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছবি চোখের সামনে তুলে ধরে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল জায়গা থেকে আগত মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী সমাজের কতক লোক এখানে বাস করছেন। এঁদের মধ্যে উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী বহু আছেন। এঁদের গঠন শক্তির পরিচয় লাভ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ছেড়ে আসা বাড়ীঘর ও ফেলে আসা বিষয়, বিত্ত ও বৈভবের প্রতি কোন প্রকার আকর্ষণ বা মোহ না রেখে সমাজহীন জীবনে নতুন সমাজ এঁরা তৈরী করেছেন। স্বাবলম্বনের উদ্যম না থাকলে এতগুলি পরিবার বাইরের কোন প্রকার সহায়তার মুখাপেক্ষী না হয়ে মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করতে পারতেন না। প্রথম যখন ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে যাদবপুর এবং টালিগঞ্জের মধ্যবর্তী এই জনহীন প্রান্তরে বাস্তুহারার দল এসেছিলেন, তখন এখানে জনহীন ফাঁকা প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আজ এখানে আঠারোশত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের বাসস্থান তৈরী হয়েছে। প্রায় বিশ হাজার মানুষ এই নির্জন প্রান্তরের বুকে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। আজকের এই নবজাত উপনিবেশ অনেকটা সুসম্বদ্ধ ও শ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।"

১৯৫১ সালের ১৪ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আর আহমেদ বিজয়গড় কলোনীর "রিফিউজি কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স স্টোর্স লিঃ" এর নব নির্মিত গৃহের দ্বারোদঘাটন করবার জন্য বিজয়গড়ে পদার্পণ করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যাপীঠ ভবনে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়গড় কলোনীর সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কলোনীর অধিবাসীদের পক্ষ থেকে কলোনীর সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

(কালাভাই) মন্ত্রী মহোদয়কে অভিনন্দন জানান।

এই ঘটনা বিবৃত করে ১৯৫১ সালের ১৮ই নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় বিস্তারিত খবর বের হল। লেখা হলঃ

"গত ১৪ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আর আহমেদ বিজয়গড় কলোনীর "রিফিউজি কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স স্টোর্স লিঃ" এর নব নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যাপীঠ ভবনে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়গড় কলোনীর সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রারম্ভে বিজয়গড় কলোনীর অধিবাসীদের পক্ষ হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মন্ত্রী মহোদয়কে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, যে স্থানে আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, সে স্থানে আজ আপনি এক নূতন সমাজ-জীবনের অঙ্কুরোদগম অনুভব করিতে পারিবেন।

কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স স্টোর্স লিঃ-এর পক্ষ হইতে মন্ত্রী মহাশয়কে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। স্টোর্স-এর সম্পাদক শ্রীশ্যামল কর উপস্থিত সকলকেই সাদর সংবর্ধনা জানাইয়া কিভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিয়া এই স্টোর্স একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন, আপনাদের এই জনপদ যাহাতে শহর পরিকল্পনার দ্বারা সর্বতোভাবে উন্নতি লাভ করিতে পারে, সরকার নিশ্চয়ই তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন।

সভারম্ভের পূর্বে ডাঃ আহমেদ বিজয়গড়ের গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত তাঁহাকে এই কলোনীর ইতিহাস জ্ঞাপন করেন।"

সাত

বিজয়গড় কলেজ প্রতিষ্ঠা। মেহেরচাঁদ খান্নার বিজয়গড় কলেজ পরিদর্শন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে মানপত্র প্রদান।

সমস্ত সৃষ্টিরই একটা ইতিহাস থাকে। সমস্ত সৃষ্টির পিছনেই থাকে একটা যন্ত্রণাবোধ। আর এই যন্ত্রণাবোধই অস্থির করে তুলেছিল তাঁদের, সেদিন যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিজয়গড় কলোনী গড়ার কাজে। শিক্ষা চাই। শুধুই বাসস্থান নয়। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন। এই সব অসহায়, ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের একমাত্র সম্বল ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। এদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষার আলো না দিতে পারলে শুধুই বাসস্থান নিয়ে জীবন ধারণের সংগ্রামে বেঁচে থাকতে পারবে না কেউ। সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠবে না সমাজ জীবনে।

অল্পদিনের মধ্যেই একাধিক প্রাইমারী স্কুল গড়ে উঠেছিল বিজয়গড়ে। গড়ে উঠেছিল ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরো বেশি করে শিক্ষা দিতে হবে ছেলে মেয়েদের। প্রয়োজন কলেজের। সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে মেয়েদের অল্প পয়সায়, প্রয়োজনে বিনা পয়সায় পড়াবার দায়িত্ব নেবে কোন্ কলেজ? পড়বার ইচ্ছা আছে যথেষ্ট কিন্তু মাইনে চালাবার সংস্থান নেই অনেকেরই। তবে কি উচ্চশিক্ষার মুখ দেখতে পারবেনা পরবর্তী বংশধরেরা? অতএব নিজেদের কলেজ দরকার।

শুরু হ'ল সন্তোষকুমার দত্ত'র নেতৃত্বে বিজয়গড় কলেজ গড়ে তুলবার কাজ।

১৯৫০ সালের জুন। রাত্রি, প্রায় বারোটা। বিজয়গড় এসোসিয়েশনের মিটিং চলছে বিজয়গড় ১ নম্বর ওয়ার্ডের অফিস ঘরে। সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত। এই পল্লীরই একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ভূপেন্দ্রলাল নাগও উপস্থিত সেখানে। অধ্যাপক সমর চৌধুরী এবং অধ্যাপক সুকুমার চক্রবর্তী এঁরাও গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। এঁরা দু'জনেও ছিলেন এই পল্লীরই বিশিষ্ট অধিবাসী।

মিটিং-এর পর সন্তোষকুমার দত্ত'র বাড়ীতে বসে চারজনে আলোচনা করে সাব্যস্ত হল একটি কলেজ তৈরী করতে হবে বিজয়গড়ে। নাম হবে বিজয়গড় কলেজ। পয়সার অভাবে যেখান থেকে ফিরে যেতে হবে না কাউকে। পড়বার

আগ্রহ যদি কারো থাকে তবে এই কলেজে তার পড়বার ব্যবস্থা হবেই।

পরের দিনই সন্ধ্যার পর একটি জরুরী সভা বসল সন্তোষকুমার দত্ত'র বাড়ীতে। সন্তোষকুমার দত্ত, অধ্যাপক সমর চৌধুরী, অধ্যাপক সুকুমার চক্রবর্তী এবং ভূপেন্দ্রলাল নাগ এঁরা সকলেই উপস্থিত হলেন সেই সভায়। সন্তোষকুমার দত্তকে নেতৃত্বে রেখে সভায় এঁদেরকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরী হল কলেজের জন্য। এই সভায় অমূল্য কিশোর চক্রবর্তীর নামও প্রস্তাবিত এবং গৃহীত হল কমিটিতে। সাব্যস্ত হল, যাকে দিয়ে কলেজের কাজে সাহায্য হবে এমন একজন কাউকে বাইরে থেকে সভাপতি হিসাবে কমিটিতে নিয়ে আসা হবে।

পকেট হাতড়িয়ে দশ আনা পয়সা পাওয়া গেল ঐ সভায়। এই দশ আনাই হল কলেজের প্রথম মূলধন।

সন্তোষকুমার দত্ত'র সভাপতিত্বে পরে বিজয়গড় এসোসিয়েশনের সভায় এই কলেজ সম্পর্কে প্রস্তাব পাস করিয়ে নেওয়া হয়। ঠিক হয়, যে ব্যারাক ঘর তখনও মিলিটারীদের দখলে ছিল সেটি মিলিটারীদের কবল মুক্ত হলেই সেখানে কলেজ শুরু করা হবে।

তদানীন্তন রিফিউজি রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেশন-এর কমিশনার এবং সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যারাক ঘরটি পাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তদানীন্তন G.O.C. Eastern Command, S.B.S. Roy-এর সাথে দেখা করতে বলেন। সন্তোষকুমার দত্ত'র নেতৃত্বে G.O.C. Eastern Command-এর সাথে তাঁর অফিসে বসে কথা হয়। তিনি নিজেও ছিলেন পূর্ববঙ্গের মানুষ। কাজেই উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সহযোগিতার মনোভাব দেখাতে সেদিন তিনি কোন কার্পণ্য করেননি।

কয়েকদিন পরে আবার S.B.S. Roy-এর সাথে যোগাযোগ করা হয়। ১৯৫০ সালের ২১শে আগস্ট সকালে তিনি বিজয়গড় পরিদর্শন করতে আসেন। স্থানীয় স্কুল ঘরে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী দত্ত ছিলেন এই উদ্বাস্তু পল্লীর তৎকালীন নেত্রী স্থানীয়দের মাসিমা। তাঁর পরিবারের অনেকেই ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন সৈনিক। তিনি মেজর জেনারেল S.B.S. Roy-কে ফুল চন্দন এবং ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। জাগরণী ক্লাব তখন ছিল কাঠের পাটাতন দিয়ে ঘেরা। সেই ক্লাব ঘরে বসিয়ে সেদিন তাঁকে আপ্যায়নের কোন ত্রুটি করা হয়নি। এই ঘটনা বর্ণনা করে ১৯৫০ সালের ২৪শে আগস্ট লোকসেবক পত্রিকায় "যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীতে মেজর জেনারেল সত্যব্রত সিংহ রায়" শিরোনামায় খবর প্রকাশিত হল ঃ

"গত ২১শে আগস্ট প্রাতে ৮ ঘটিকায় যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লীর কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল সত্যব্রত সিংহরায় পল্লী পরিদর্শন করিতে আগমন করিলে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। আজাদ বঙ্গীয় সেবাদল সামরিক কায়দায় ও মহিলাগণ শঙ্খধ্বনি সহকারে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহে এক সংবর্ধনা সভায় একজন বর্ষিয়সী মহিলা তাঁহাকে ফুল, চন্দন ও ধান-দূর্বা দ্বারা আশীর্বাদ করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মাল্যভূষিত করা হয়। সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং বলেন যে, আজ এই বিরাট স্বাবলম্বী পল্লীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করায় তাহারা গৌরব বোধ করিতেছেন। কারণ মেজর জেনারেল সিংহ বাঙালীর গৌরব। সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত লেখাপড়া করিয়া আদর্শ নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিতে উপদেশ দেন।

অতঃপর তিনি স্থানীয় হাসপাতাল ও যুব প্রতিষ্ঠান "জাগরণী" পরিদর্শন করেন। জাগরণী গৃহে তাঁহাকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় এবং তথায় আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এই পল্লীর অধিবাসীদের বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের নানাবিধ সংগঠন মূলক কর্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বিদায় কালে জাগরণীর গ্রন্থাগারে কিছু পুস্তক দানের প্রতিশ্রুতি দান করেন।"

এই পল্লী পরিদর্শনের পর মেজর জেনারেল S.B.S. Roy মহাশয় ব্যারাক ঘরটিকে শিক্ষার প্রয়োজনে বিজয়গড় এসোসিয়েশন-এর হাতে সমর্পণ করেন। বিজয়গড়ের তৎকালীন সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত এবং সাধারণ সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই) এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে S.B.S. Roy মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৯৫০ সালের ২রা নভেম্বর। এই ব্যারাক ঘরেই কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। নাম বিজয়গড় কলেজ। সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হল সমগ্র ভারতবর্ষে উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় একটি কলেজ।

কলেজের দ্বার উদ্‌ঘাটন করানো হল নব্য প্রতিষ্ঠিত এই কলেজেরই প্রথম চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী শ্রীযুক্ত শরৎ দাসকে দিয়ে। তাঁর বক্তব্য থেকেই জানা যায় যে সেই সময় তাঁর বেতন ছিল মাত্র তিন টাকা। দ্বারোদঘাটন করিয়ে তাঁকেই প্রথম প্রবেশ করানো হ'ল কলেজ প্রাঙ্গণে এবং তখন থেকেই তাঁর নাম হ'ল "লক্ষ্মী"।

স্কুল গণ্ডীর সীমানা পেরিয়ে যাঁরা সেদিন ঘরে বসেছিলেন তাঁদেরই কয়েকজনকে ডেকে আনা হল কলেজ প্রাঙ্গণে। তাঁরাই হলেন কলেজের প্রথম বিদ্যার্থী। মেঝের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে বসবার জায়গা হল তাঁদের। অবসর মত বিনা বেতনে ক্লাস নিয়ে যেতেন চাকুরিজীবী এম. এ. পাস স্থানীয় ভদ্রলোক কয়েকজন। পরে কয়েকজন স্থানীয় কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর আনুকূল্যে কয়েকখানি বেঞ্চ যোগাড় করা সম্ভব হল ছাত্র-ছাত্রীদের বসবার জন্য।

অধ্যক্ষের কার্যভার পরিচালনা করতেন অধ্যাপক সুকুমার চক্রবর্তী। কিন্তু কয়েকদিন পরে ১৯৫১ সালের জানুয়ারীতে তিনি উগান্ডায় অধ্যাপক হয়ে চলে যান। এই সময় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কিছুদিন অধ্যক্ষের কাজ চালান। কিছুদিন পরে অধ্যাপক সমর চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গ্রন্থাগার পরিচালনা করতেন ভূপেন্দ্রলাল নাগ। এঁরা সকলেই ছিলেন সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রচেষ্টা শুরু হল। ইতিমধ্যে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু কলেজ কমিটিতে সভাপতি নিযুক্ত হন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই), নগেন্দ্রনাথ পাল, সুকুমার গুপ্ত এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেন এবং ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী কলেজ কমিটিতে যোগ দেন। ডঃ ত্রিগুণা সেন সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন এবং সন্তোষকুমার দত্ত কলেজের সম্পাদকের কাজ পরিচালনা করতে থাকেন।

ডঃ বি. বি. দত্ত এবং জে. পি. নিয়োগী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একদিন কলেজ পরিদর্শন করে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের ভরসা পাওয়া গেল। কিন্তু 'রিজার্ভ ফান্ড' হিসাবে কলেজের নামে বিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে।

দুশ্চিন্তায় পড়লেন কলেজ কমিটি। মাত্র দশ আনা মূলধন করে যে কলেজের প্রতিষ্ঠা, এত টাকা তার জুটবে কেমন করে? কিন্তু কাজে নেমে পিছিয়ে যাবার ইতিহাস বিজয়গড় সৃষ্টির ইতিহাস নয়।

সিনেমার টিকিট বিক্রি করে, চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা শুরু হল। সেই টাকা দিয়ে একটা একাউন্ট খোলা হল কলেজের নামে। কিন্তু আরো টাকা প্রয়োজন। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া যাবে না। শুরু হল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। শুধু মাত্র মৌখিক কথায় ডাঃ অপর্ণাচরণ দত্ত সহ কয়েকজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাকা ঋণ গ্রহণ করে পূরণ করা হল সেই টাকা। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়েও এই সময় অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানও স্মরণীয়। তিনি সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৫১ সালে এই কলেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেল। কিন্তু কলেজ চালাতে হলে আরো অর্থের প্রয়োজন। সুকুমার গুপ্তর মাধ্যমে সেই সময় শ্রদ্ধেয় পি. সি. রায়ের সাথে যোগাযোগ করা হ'ল। তিনি ছিলেন একজন কাষ্ঠ ব্যবসায়ী। পি. সি. রায়ের দিদিমা শ্রদ্ধেয়া উত্তমাসুন্দরী দেবী বিশ হাজার টাকা এবং কিছু কাঠ কলেজের নামে দান করতে রাজী হন। তিনি তাঁর শর্ত অনুযায়ী কলেজটির নাম "জ্যোতিষ রায় কলেজ, বিজয়গড়" করবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিজয়গড়ের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ "বিজয়গড়" শব্দটিকে সব সময়ই বিশেষ মর্যাদাসহ অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁরা বিজয়গড় শব্দটিকে "জ্যোতিষ রায় কলেজ"-এর আগে বসাবার জন্য অনুরোধ করেন। এর ফলে এই কলেজটির নামকরণ হয় "বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ"। স্বর্গীয় জ্যোতিষ রায় ছিলেন তাঁর মেয়ের স্বামী। শর্ত অনুযায়ী এই কলেজ কমিটিতে তাঁর তিনজন প্রতিনিধিও থাকবেন ঠিক হয়।

কলেজ পরিচালন সমিতি এই শর্ত মেনে নেন এবং এই টাকা পেয়ে যাঁদের কাছ থেকে ফেরৎ দেবার অঙ্গীকারে টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের টাকা পরিশোধ করে দেন।

কলেজ তখন পূর্ণ উদ্যমে চলছে। বেশ কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক নামমাত্র বেতনের বিনিময়ে অধ্যাপনা করতে এগিয়ে এলেন। ছাত্র-ছাত্রীও আগের তুলনায় বেড়েছে অনেক। আর্থিক অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হয়েছে কলেজের।

এই সময় অধ্যাপক সমর চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে কলেজের স্থায়ী সহ-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ হন সতীশচন্দ্র চৌধুরী (এম. এ. অক্সন) মহাশয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি বিজয়গড় কলেজ পরিদর্শন করে ১৯৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতিবেদন লিখলেনঃ

"যাদবপুর অঞ্চলের বিজয়গড় কলোনীতে এই বৎসর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েকজন উৎসাহী সমাজ কল্যাণব্রতী শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিয়া উপযুক্ত পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপকের সাহায্যে এই কলেজের প্রথম

বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত চলিতেছে। ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করার জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহা শীঘ্রই একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইবে।"

উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় যাঁরা একদিন সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থায় কলেজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁদের আশার মুকুল ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতে লাগল। পয়সার অভাবে যেখান থেকে ফিরে যেতে হয়নি কাউকে। পড়বার আগ্রহ থাকলে এই কলেজে তার পড়বার ব্যবস্থা হয়েছেই (With a missionary spirit this college was started)।

এই কলেজ গড়ে উঠবার সময় যে সকল কলেজ কর্মচারী প্রথম অবস্থায় বিনা বেতনে এবং পরবর্তী সময়ে নামমাত্র বেতনে এই কলেজকে দিনের পর দিন সেবা করে গেছেন তাঁদের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সময় ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন মাননীয় মেহেরচাঁদ খান্না মহাশয়। কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্বন্ধে তিনি আগে থেকেই অবহিত ছিলেন। মাননীয় মেহেরচাঁদ খান্না মহাশয় কর্ম উপলক্ষে একদিন কলকাতায় এলে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের অনুরোধে তিনি বিজয়গড় পরিদর্শন করতে আসেন।

শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী দত্ত ফুল চন্দন দিয়ে তাঁকে বরণ করেন। বিজয়গড় এসোসিয়েশনের তৎকালীন সভাপতি এবং কলেজের সম্পাদক সন্তোষকুমার দত্ত মন্ত্রী মহোদয়কে ঘুরে ঘুরে সমস্ত কিছু পরিদর্শন করান এবং সমস্ত বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে বিশদ আলোচনা করেন। উদ্বাস্তুদের একান্তই নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রথম গড়ে ওঠা বিজয়গড় কলেজ পরিদর্শন করে সেদিন এই কলেজকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যান মন্ত্রী মহোদয়।

সন্তোষকুমার দত্ত'র একান্ত অনুরোধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিজয়গড় কলেজকে সেই সময় কিছু আর্থিক সাহায্যও প্রদান করেন। এই আর্থিক সাহায্যই ছিল সেই সময় বিজয়গড় কলেজ কর্তৃক পাওয়া প্রথম সরকারী সাহায্য। সেই টাকা দিয়ে কিছু টিন কিনে বিজয়গড় কলেজের কিছুটা সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করা হয়।

অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কিছুদিন পরে পরলোক গমন করেন এবং সমর চৌধুরী পুনরায় অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

এই সময় একদিন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী যিনি সন্তোষকুমার দত্ত'র বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং কলেজ পরিচালন সমিতির একজন

বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, সন্তোষকুমার দত্ত'র বাড়ীতে এসে শ্রদ্ধেয় অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীকে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করবার প্রস্তাব করেন। অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় সেই সময় ঢাকা থেকে এসে কলকাতায় বসবাস করছিলেন।

ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীকে সাথে নিয়ে একদিন সন্তোষকুমার দত্ত'র বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তাঁদের ভিতর কথাবার্তা হয়।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যাপক সমর চৌধুরী মহাশয় সহ-অধ্যক্ষ হয়ে কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পরে অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় ছুটি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত কন্ট্রোলারের কার্যভার গ্রহণ করে চলে যান। পবিত্র দাশগুপ্ত মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন।

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় বেশি দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন না। পুনরায় তিনি কিছুদিন পর কলেজের অধ্যক্ষের পদে ফিরে আসেন।

১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এই কলেজ পরিদর্শনে এলে তৎকালীন কলেজ অধ্যক্ষ অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁকে কলেজের পক্ষ থেকে এই কলেজের সৃষ্টির ইতিহাস সংবলিত একটি মানপত্র প্রদান করেন। তাতে বলা হয় ঃ

"We offer you our heartfelt greetings on this great occasion. We are proud to have you in our midst this afternoon. This refugee area has been struggling hard to organise its life with a special emphasis on culture. Hence the Vijaygarh Jyotish Roy College, which we have the honour to represent, occupies a very important place in the scheme for the cultural rehabilitation of this vast refugee belt. I expect you would be interested to know that this college started with only 50 students in 1950 and has now on its rolls about 550.

You will pardon me, sir, if I take this opportunity, to briefly trace the history of this college. To many an onlooker the college is a miracle, coming into existence almost out of nothing a dream-land fancy come true. The college started digging its first foundations with a provisional Organising Committee, consisting of the following gentlemen of the locality: Shree Amulya Kishore Chakravarti, Shree Santosh Kumar Datta, Shree Bhupendralal Nag, Shree Sukumar Chakravarti, Shree Samar Choudhury.

The committee was fortunate enough to have at the helm of

Vijaygarh Jyotish Ray College
CALCUTTA-32.

..........195

Hon'ble Sir and ladies and gentlemen present,

We offer you our heartfelt greetings on this great occasion. We are proud to have you in our ~~your visit~~ midst this afternoon. This refugee area has been struggling hard to ~~rebuild~~ organise its life with a special emphasis on culture. Hence the Vijaygarh Jyotish Ray College, which we have the honour to represent, occupies a very important place in the scheme for the cultural rehabilitation of this vast refugee belt. I expect you would be interested to know that this college started with only 50 students in 1950 and has now on its rolls about 550.

অধ্যক্ষ মহাশয়ের লেখা মানপত্রের খসড়ার অংশবিশেষ

Vijaygarh Jyotish Ray College
CALCUTTA-32

..........195 .

fortunate enough to have at the helm of its affairs from its very inception an educationist of the eminence of Shree Prasanta Kumar Basu, Principal, Bangabasi College, Calcutta. A little later three other local gentlemen, Shree Nagendranath Paul, Shree Sukumar Gupta and Shree Dhirendranath Roy Choudhury (popularly known as Kalathai) came to joined the Provisional Committee. Dr. T. Sen, now the Mayor of Calcutta, and Dr. M.L. Roy Choudhury, Head of the Deptt of Islamic History, Calcutta University, also came to be associated the College Committee at this stage and the College owes a lot to their help and guidance

its affairs from its very inception an educationist of the eminence of Shree Prasanta Kumar Basu, Principal, Bangabasi College, Calcutta. A little later three local gentlemen, Shree Nagendranath Paul, Shree Sukumar Gupta and Shree Dhirendranath Roy Choudhury (Popularly known as Kalabhai) joined the Provisional committee. Dr. T. Sen, now the mayor of Calcutta, and Dr. M.L. Roy Choudhury, Head of the Department of Islamic History, Calcutta University, also came to be associated with the college Committee at this stage and the college owes a lot to their help and guidance....."

সেদিন যে সমস্ত উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের অর্থের সংকুলান করতে না পারবার জন্য হয়তো পড়া বন্ধ হয়ে যেতো, এই কলেজের সেই সকল উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রীরাই নামমাত্র বেতনে, বহু ক্ষেত্রে বিনা বেতনেও কলেজের অধ্যয়ন শেষ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে যথার্থ শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব এই কলেজের অনেকখানি। এই কারণেই বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য, যাঁরা এই কলেজ সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের অবদান।

যাঁরা একদিন সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থায়ও এই কলেজ প্রতিষ্ঠার দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটা ধাপ পর্যন্ত হয়তো কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারী অর্থানুকূল্যের প্রয়োজন পড়বেই। বিনা সরকারী অর্থানুকূল্যে এই কলেজকে টিকিয়ে রাখা হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই কারণেই তৎকালীন পরিচালন সমিতি কলেজটিকে "গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ"-এর অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সরকারী তরফের সহানুভূতিও তাঁরা আদায় করেছিলেন, কিন্তু কলেজটিকে স্পনসর্ড কলেজের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হ'ল না।

আট

বিজয়গড়ের অনুকরণে অন্যান্য উদ্বাস্তু অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা। বিধানসভার স্পীকার এবং উদ্বাস্তু দপ্তরের উপমন্ত্রীর বিজয়গড় পরিদর্শন। নাটক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মণিমেলার প্রতিষ্ঠা। খেলাধূলার প্রচলন। ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা। মহিলা শিল্প সমিতি। সন্তোষকুমার দত্তকে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি।

ইতিমধ্যে বিজয়গড়ের স্থায়িত্ব লক্ষ করে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী উদ্বাস্তু মানুষদের নেতৃত্বে আশেপাশে আরো বহু উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠতে শুরু করল। এই সব উপনিবেশ গড়ে উঠতে শুরু করল বিজয়গড়ের অনুকরণেই সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায়।

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তাঁর "The Marginal Men" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

"..... Vijaygarh was the first example of such a colony. It had not the sanction of law behind it. Very few people knew that Santosh Datta's lead in unauthorized occupation of Government land received prior approval of the Government. So when the colony which apparently sprang out of unauthorized occupation of land was allowed to exist, there were many among the refugees who believed that if only they could take an organized plunge, they could easily get away with the land as the Vijaygarh people had done."

সেই সময় বিজয়গড়ের অনুকরণে আশেপাশে আরো অনেক উদ্বাস্তু অঞ্চল গড়ে উঠতে শুরু করলেও এগারোটি ওয়ার্ডের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল বিজয়গড়। এই এলাকার বাইরে বিজয়গড়ের সীমানা বাড়াবার জন্য আর কোন প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যদের অস্থায়ী শিবির স্থাপনের জন্য সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জায়গার বাইরে গিয়ে নিজেদের সীমানা বাড়াবার ইচ্ছাও তৎকালীন নেতৃবৃন্দের ছিল না। ইতিমধ্যেই বিজয়গড়ের সংলগ্ন এলাকার একপাশে গান্ধী কলোনী, পল্লীশ্রী, শ্রী কলোনী এবং আর একপাশে অরবিন্দ নগর, তার পিছনে সমাজগড় ও অশ্বিনী নগর, আর তারও পিছনে আজাদগড় এবং আশে পাশে আরো অনেক উদ্বাস্তু উপনিবেশ উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ

নিজেদের প্রচেষ্টায় বিজয়গড়ের অনুকরণে তখন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। যার ইঙ্গিত "The Marginal Men" গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সকল উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সেই সময় বিজয়গড়ের সহযোগিতা এবং অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। বিজয়গড়ের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাই সেদিন সম্ভব করে তুলেছিল এই বিস্তৃত অঞ্চলকে একটি স্থায়ী উদ্বাস্তু অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে।

অন্যান্য সকল স্মরণীয় দিবস উদ্‌যাপনের মতো বিজয়গড়ের প্রতিষ্ঠা দিবসও প্রতি বৎসর মহা উৎসাহে উদ্‌যাপন করা হ'ত। নানা প্রকার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ত এই সময়।

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে এমনি করেই বহুবিধ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়গড়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিজয়গড়ে ঐদিন একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন বিধান সভার তৎকালীন স্পীকার শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী বিজেশ সেন মহাশয় ঐ সভায় ভাষণ দেন। ঐ সভা আরম্ভ হবার পূর্বে বিজয়গড়ের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে ১৯৫৩ সালের ২০শে এপ্রিল "Hindusthan Standard" পত্রিকায় লেখা হল ঃ

"With the future shrouded in uncertainty, the refugee settlers of Vijaygarh colony, one of the many "Squatters" colonies sprawling round about Calcutta, celebrated the sixth foundation day of the colony on Sunday evening.

Situated in Jadavpur area, over a land-space of 129.50 acres, the colony shelters, nearly a thousand refugee families, officially termed "squatters", developed entirely on the initiative of the refugees themselves. Vijaygarh colony, like similar other colonies in West Bengal, is yet to be regularised by Government."

এরপর আরো উল্লেখ করা হল ঃ

"While the West Bengal Assembly speaker Sri Saila Kumar Mukherjee, presiding at the foundation day function of the colony, praised the efforts of the organisers—Jadavpur Refugee Association in developing the colony as an outstanding work of reconstruction. Sri Bijesh Sen, Deputy Rehabilitation Minister, frankly admitted that the "squatters" colonies were much better organised than Government ones.

In his report, Sri Dhirendranath Roy Chowdhury, Joint Secretary of the Association, pointed out that in the last five years they had been able to establish one recognised college, two recognised High Schools with a total of 2,400 students and eight free Primary Schools with 2,000 students on the rolls, in the colony.

On the question of regularisation of the colony, Sri Roy Chowdhury quoting a Government letter said that Government had agreed in 1951 to take steps for aquisition of the area under occupation of the refugees there...."

সেদিন সেই সভায় বিজয়গড় কলোনীর অধিবাসীগণের উদ্যমের প্রশংসা করা হয়েছে। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা হয়েছে বিজয়গড়ের। সেই সাথে যতগুলি সম্ভব অননুমোদিত কলোনীকে অনুমোদন দান করবার সরকারের নীতির প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু শুধুই তো স্কুল, কলেজ আর হাসপাতাল নয়! পূর্ববঙ্গের মানুষদের নিজস্ব সংস্কৃতিও ছিল একদিন। সেই সংস্কৃতি হারিয়ে গেলে আপন সত্তার বৈশিষ্ট্যই যে বিনষ্ট হয়ে যাবে তাঁদের।

অতএব আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকবার তাগিদেই সেদিন খেলাধূলা এবং সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠল বিজয়গড়।

মিলিটারীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলঘর যেটা ছিল বিজয়গড়ের প্রাণকেন্দ্র, (বর্তমানে নিরঞ্জন সদন) সেটা "বিজয়গড় হল" নামেই পরিচিত ছিল সেই সময়ে। সেখানে বিজয়গড় গড়ে উঠবার সময় সন্তোষকুমার দত্ত'র সভাপতিত্বে বহু গুরুত্বপূর্ণ সভা যেমন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই সাথে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নাটকও অনুষ্ঠিত হতে লাগল নিয়মিত। আর এই নাটকের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রদ্ধেয় নলিনীমোহন দাশগুপ্ত। তিনি নিজেও নাটক লিখতেন এবং সেই সকল নাটক মঞ্চস্থ হত এই হলঘরে। এ ভিন্ন অন্যান্য বিখ্যাত নাট্যকারদের রচিত নাটকও মঞ্চস্থ করা হ'ত।

ডাঃ শচীন ব্যানার্জী চৌধুরীর ডাক্তারখানা ছিল বিজয়গড় নয় নম্বর ওয়ার্ডের বড় রাস্তার উপরেই। কোন নাটক মঞ্চস্থ হবার পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে সেই টালির চালা সংবলিত ডাক্তারখানার ঘরে বসে চলত সেই নাটক সম্পর্কে আলোচনা। এই আলোচনায় যাঁরা অংশ নিতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রচণ্ড রকম উৎসাহী। ফলে এই আলোচনা বহু সময়ই প্রচণ্ড রকম উচ্চস্বরে গিয়ে পৌঁছত। ডাঃ শচীন ব্যানার্জী চৌধুরী নিজেও বহু সময় নাটকের গান রচনা করে দিতেন।

নলিনীমোহন দাশগুপ্ত নাটকের নির্দেশনায় থাকলেও বহু সময়ই সহ-নির্দেশক হিসাবে থাকতেন চিত্ত দে। চিত্ত দে নিজেও ছিলেন সার্থক অভিনেতা। নির্দেশক হিসেবেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন অনেক নাটকেই।

আর একজন অভিনেতা ছিলেন ভূপেন্দ্রলাল নাগ মহাশয়। "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে সেই সময়ে ভূপেন্দ্রলাল নাগ-এর সেকেন্দার শা'র অভিনয় দেখে নিশ্চয়ই কারো পক্ষে তাঁর গায়ের রংয়ের ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক ঘটেনি। কিন্তু পরে সেই রং ধুয়ে গায়ের আসল রং ফিরিয়ে আনবার আপ্রাণ প্রচেষ্টার কথা তিনি নিজেই অনেকবার হাসতে হাসতে বর্ণনা করেছেন অনেকের কাছে। চাণক্য'র ভূমিকায় সেদিন সার্থক অভিনেতা ছিলেন নলিনীমোহন দাশগুপ্ত।

"কর্ণার্জুন" নাটকে ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই)-এর শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় সেদিন যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আজও সেই সুন্দর দৃশ্য স্মরণ করতে পারবেন।

আদিত্য বোস, বিক্রমজিৎ দত্ত, বাহাদুর সোম এমনি আরও বহু জনই ছিলেন এই সকল নাটকের সার্থক অভিনেতা। এঁরা সকলেই ছিলেন এই পল্লীরই উদ্বাস্তু অধিবাসী। এই অঞ্চল গড়ে উঠবার সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই উদ্বাস্তু অঞ্চল গড়ে তুলবার সাথে সাথে অনেক কর্ম ক্লান্তির ভিতরেও তাঁরা সেদিন এই সকল নাটক মঞ্চস্থ করে এই অঞ্চলে রেখে গেছেন তাঁদের নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। পরবর্তী সময়ে আশপাশ অঞ্চলের কিছু নাটক প্রিয় উদ্বাস্তুরাও এই সকল নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন। এই নাটকের সাজপোশাক করবার দায়িত্বে সেই সময় থাকতেন শ্রদ্ধেয় সুশীল ব্যানার্জী মহাশয়। তিনি নিজেও ছিলেন এই অঞ্চলেরই একজন উদ্বাস্তু অধিবাসী।

সমস্ত রাত্রি ধরে সেই সময় নলিনীমোহন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে বিজয়গড় হলে এই সকল নাটক অভিনীত হ'ত। প্রথম দিকে এই সকল নাটকে পুরুষ অভিনেতারাই স্ত্রীলোকের ভূমিকাতেও অভিনয় করতেন। পরবর্তীকালে স্ত্রীলোকের ভূমিকা স্ত্রীলোক দিয়েই করান হয়। হ্যাজাক জ্বালিয়ে অনুষ্ঠিত হত এই সকল নাটক।

এই সকল নাটক ছিল সেই সময় বিজয়গড়ের অনেক দুঃখ, অনেক দৈন্যের ভিতরেও আনন্দের উপকরণ। এই আনন্দই সেদিন মানুষকে ক্লান্ত হতে দেয়নি তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায়। সব কিছু হারাবার বেদনাকেও সেদিন ভুলিয়ে রেখেছে অনাবিল আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে। অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে সমস্ত রাত্রি ধরে সেই সময় উপভোগ করেছেন সেই সকল নাটক এই অঞ্চলের উদ্বাস্তু

অধিবাসীবৃন্দ।

পূর্ববঙ্গের এই সকল মানুষদের নিজস্ব কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশ বিভাগের ফলে তাঁরা যখন দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে লাগলেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের নিয়ে আসা সেই নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির মেল-বন্ধন ঘটতে শুরু করল। ফলে, এই সকল উদ্বাস্তুদের আগমনে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার আধিক্য যেমন ঘটল, সেই সাথে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির জগৎও ক্রমেই আরো গতিশীল হয়ে উঠতে লাগল সন্দেহ নেই।

বিজয়গড় তখন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক চর্চা, নাটক সব কিছুরই পীঠস্থান। এক কথায় এক প্রাণবন্ত উপনিবেশ হিসেবেই গড়ে উঠেছে এই অঞ্চল।

"জাগরণী" ক্লাব, যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিজয়গড় প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় শুরুর লগ্নেই এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আরো অন্যান্য যুব প্রতিষ্ঠান সকলে মিলে নিজেদের ভেতর নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক চর্চা এবং খেলাধূলার প্রতিযোগিতার আসর গড়ে তুললেন বিজয়গড়ে। বিজয়গড়ের আকাশে বাতাসে তখন প্রাণের স্পন্দন। যৌবনের উদ্দীপনা।

কিন্তু আজকের শিশুই তো আগামী কালের যুবক। অতএব শৈশব অবস্থাতেই তাদের মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে তোলাও একান্ত প্রয়োজন। তাদের শরীর ও মন সুস্থ রাখবার জন্য চাই খেলাধূলা। ১৯৫৫ সালে বিজয়গড়ে শম্ভু গুহঠাকুরতার তত্ত্বাবধানে এবং সেই সময়ের বিশিষ্ট কিশোর কর্মী, প্রাণোচ্ছল, উপযুক্ত সংগঠক এবং দৃঢ়চেতা সুবীর মুখার্জীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গড়ে উঠলো শিশুদের একান্ত ভাবেই নিজস্ব সংগঠন 'মণিমেলা'। সুবীর মুখার্জী মণিমেলার কেন্দ্রীয় সমিতিরও সদস্য ছিলেন। এই অঞ্চলের শিশুদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে এবং চরিত্র গঠনে সেদিন এই মণিমেলার অবদান ছিল অনেকখানি।

শুধুমাত্র শিশুরা তো নয়!

দেশ বিভাগের পূর্বে ওপার বাংলার বিস্তৃত মাঠের খোলা হাওয়ায় যে যুবকরা দাপিয়ে বেড়াতেন একদিন, মেতে উঠতেন বিভিন্ন খেলাধূলায়, নানান প্রতিযোগিতায়, দেশ বিভাগের ফলে এপার বাংলার সংকীর্ণ বদ্ধ জায়গায় আবদ্ধ হয়ে সেদিনের সেই যুবকরাই হাঁপিয়ে উঠতে লাগলেন ক্রমে। খেলাধূলার ব্যবস্থা চাই। শরীর গড়ে তুলবার জন্য চাই খেলাধূলা। কিন্তু খেলাধূলার পরিবেশ কোথায়?

তখন শুধুই বেঁচে থাকবার সংগ্রাম। জীবনযন্ত্রণার হাহাকার। আর এই হাহাকারের ভিতরেই নিজেদের অস্তিত্বকে কোনো প্রকারে টিকিয়ে রাখবার

নিদারুণ প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সাথে সেদিন সামিল সকলেই।

নতুন পরিবেশ, অপরিচিত বাসস্থান। শুধুই মাথা গুঁজবার মতো সামান্য ব্যবস্থাটুকু গড়ে উঠতে শুরু করেছে তখন। চতুর্দিকে দিবারাত্র তারই বিভিন্ন রকম শব্দ। রাত্রে ঝিঁঝির ডাক আর শেয়ালের চিৎকারে বিচিত্র পরিবেশ।

কিন্তু যত বাধাই আসুক, তাকে অতিক্রম করবার দুঃসাহসিক মানসিকতাই মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস। বিজয়গড়ও তার ব্যতিক্রম নয়।

যৌবনের দুরন্ত প্রাণশক্তির উজ্জ্বল প্রবাহকে সেদিন গতিশীল করে রাখবার জন্যই ক্রমে প্রচেষ্টা শুরু হয় খেলাধূলার আয়োজন করবার।

এই উদ্বাস্তু পল্লী গড়ে উঠবার সময় থেকেই এই অঞ্চলে যুবকদের ভিতরে খেলাধূলার প্রচলন শুরু হয়। জাগরণী ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এই উদ্বাস্তু পল্লীর প্রতিটি ওয়ার্ডকে নিয়ে একটি ওয়ার্ড লীগের ফুটবল খেলা শুরু হয়।

বর্তমানে বিজয়গড়ে যে মাঠটি রয়েছে, সেটি সেই সময় খেলার উপযুক্ত ছিল না। জায়গাটা ছিল অনেক নীচু এবং অল্প বৃষ্টিতেই জল কাদা জমে যেত প্রচুর। সেই কারণে এই পল্লী সংলগ্ন আশপাশ অঞ্চলে খেলার উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানেই চলত খেলাধূলা।

কিছুদিন পরে বিজয়গড় বড় রাস্তার সংলগ্ন মাঠটিকে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় এবং ক্রীড়া অনুরাগীদের সহযোগিতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করে খেলাধূলার উপযুক্ত করে তোলা হয়। এরপর থেকে বিজয়গড়ের খেলাধূলা বিজয়গড়ের এই মাঠেই অনুষ্ঠিত হতে লাগল। এই মাঠটির সংলগ্ন বড় মাঠটিকেও মাটি ফেলে উঁচু করা হল। কিন্তু সে আরো অনেক পরের ঘটনা।

ইতিমধ্যে এই উদ্বাস্তু পল্লীর আশেপাশে আরো অনেক উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠেছে তখন। ফলে বিজয়গড়ের এই খেলাধূলা শুধুই বিজয়গড়ের ভিতর আর কেন্দ্রীভূত থাকল না। এই বিস্তৃত উদ্বাস্তু অঞ্চলের সমস্ত উদ্বাস্তু যুব সম্প্রদায় যাতে এই খেলায় অংশ নিতে পারেন তার জন্য আনুমানিক ১৯৫০ সালে খেলাধূলায় তৎকালীন কিছু উৎসাহী ব্যক্তির নেতৃত্বে গড়ে উঠল "বিজয়গড় ফুটবল এসোসিয়েশন" বা "বি. এফ. এ."। এরপর থেকে এই বি. এফ. এ.'র পরিচালনাতেই অনুষ্ঠিত হতে লাগল প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা। ক্রিকেট এবং অন্যান্য খেলাও অনুষ্ঠিত হতে লাগল সমান ভাবে।

সেই সময় এই খেলায় অনেকেই যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে অনেকে বিজয়গড়ের সীমানা ছাড়িয়ে কলকাতা ময়দানেও

অংশগ্রহণ করেছেন প্রথম ডিভিসনের খেলায়।

যুবকদের শরীরচর্চার জন্য একদিকে যেমন ব্যায়ামাগার গড়ে উঠেছে, তেমনি আরেকদিকে উদ্বাস্তু মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলবার জন্য গড়ে উঠেছে একাধিক মহিলা শিল্পসমিতি। এই সব মহিলা শিল্পসমিতি প্রতিষ্ঠা করে সেদিন উদ্বাস্তু মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলবার কাজে সমাজসেবী কিছু কর্মযোগী মহিলারা ঐভাবে এগিয়ে এসেছিলেন বলেই সেদিন উদ্বাস্তু মহিলারা নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে নিয়ে সংসারে সামান্য হাসিটুকুও অন্তত ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিজয়গড় ছয় নম্বর ওয়ার্ডে শ্রদ্ধেয়া মীরা গুহ'র নেতৃত্বে "বঙ্গীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান"-এর যাদবপুর শাখা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মীরা গুহ এই শাখার সম্পাদিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২৪শে জুন ১৯৫০ সালের "পদাতিক" পত্রিকায় দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠানে সেই সময় প্রায় তিন শতাধিক উদ্বাস্তু মহিলা নানা প্রকার কাজের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এই প্রতিষ্ঠানের নানান বিভাগ ছিল।

১৯৫৭ সালের ২৩শে নভেম্বর থেকে ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের নবম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও কর্মীদের নিজেদের হাতে প্রস্তুত নানাবিধ সূচী ও হস্তশিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

কলকাতার তৎকালীন মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় নলিনীকিশোর গুহ মহাশয়। তিনি ছিলেন সেই সময় আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক।

১৯৫৭ সালের ২৬শে নভেম্বর যুগান্তর পত্রিকায় এই উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন বের হ'ল। লেখা হল ঃ

"......বিজয়গড় কলোনীর অধিবাসীরা গত দশ বৎসর যাবৎ নিজেদের প্রচেষ্টায় বহু প্রয়োজনীয় গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। আলো নাই, ভাল রাস্তা নাই। কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও নাগরিক সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত প্রায় ২০ সহস্র অধিবাসী বাঁচিবার আগ্রহে, ভবিষ্যৎ সন্তানদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির আশায়, আত্মমর্যাদাবোধে ও আত্মবিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিজেদের মানসিক ও আর্থিক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার কিছুটা প্রমাণ এই প্রদর্শনীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, দুঃস্থ মহিলারা যাহাতে বর্তমান অবস্থায় নিজেদের

পরিবারের বোঝাস্বরূপ না হন তজ্জন্য নয় বৎসর পূর্বে অতি সামান্যভাবে এবং অনিশ্চিত আশায় বিজয়গড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। কয়েকজন দরদী সমাজ-সেবিকার সহায়তায় এবং শুভার্থীর উৎসাহে পরম নিষ্ঠার সহিত বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে সূচীশিল্প ও দর্জির কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্ড বোর্ড ও ছোট তাঁতের কাজ এই বৎসর হইতেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে কাজ শিখিয়া অনেক মহিলাই পরিবারের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন। অনেক ছাত্রী-কর্মী এখানকার আয় দ্বারাই তাঁহাদের পড়ার সম্পূর্ণ খরচ চালাইতেছেন।.....”

ঐ পত্রিকা থেকে আরো জানা যায় যে শ্রদ্ধেয় নলিনীকিশোর গুহ সভাপতির ভাষণে কলোনীর মেয়েদের আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলবার কাজের প্রশংসা করেন।

সভায় রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় জ্যোতি মহারাজ এবং এই অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ পাল বক্তৃতা করেন। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা মীরা গুহ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এই অঞ্চলের সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই) বিজয়গড় কলোনীর পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধন এবং সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে বিজয়গড় এক নম্বর ওয়ার্ডের শ্রদ্ধেয়া সুধারানী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা “যাদবপুর মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি” এবং বিজয়গড় বাজারের কিছু পরেই শ্রদ্ধেয়া পঙ্কজিনী গুহ'র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা “মহিলা সমিতি”র নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজয়গড় ব্যায়ামাগারটি প্রথমে ছিল বিজয়গড় এক নম্বর ওয়ার্ডে। এলাকাটি ছিল ঘন বসতিপূর্ণ। পরবর্তীকালে বিজয়গড় ঠাকুরবাড়ির জন্য নির্দিষ্ট করা জায়গার পাশেই স্থান নির্দিষ্ট করে ব্যায়ামাগারটিকে স্থানান্তরিত করে আনা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন ব্যায়ামাগার। যুবকদের স্বাস্থ্যচর্চা কেন্দ্র।

১৯৫৮ সালের ১৪ই নভেম্বর বিশিষ্ট জননেতা এবং বাগ্মী শ্রদ্ধেয় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন অসহায় উদ্বাস্তু বৃদ্ধা মহিলাকে একটি চিঠি দিয়ে সন্তোষকুমার দত্ত'র কাছে পাঠালেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সন্তোষকুমার দত্ত'র একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই উদ্বাস্তু অসহায় বৃদ্ধা মহিলার কোন বাসস্থান ছিল না। দেশ বিভাগের ফলে বাড়ি ঘর ছেড়ে এসে সকলকে নিয়ে খুবই দুরবস্থার

প্রিয় সন্তোষবাবু,

এই চিঠি নিয়ে যে বৃদ্ধা আপনার কাছে যাচ্ছেন তাঁর কাছ থেকেই সব জানতে পারবেন। আপনাকে আর কি বলবো! আপনার প্রাণে অসহায়দের প্রতি দরদ আছে, তাই যা করবার করবেন। একদিন আসুন না কেন? অনেক দিন তো বসে গল্প করা হয় নি। প্রীতিনমস্কার জানবেন। ইতি

ভবদীয়

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪নং, এলগিন রোড
কলিকাতা-২০
১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮

ভিতর তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন সেই সময়। অত্যাচারের ভয়ে সদ্য দেশ থেকে পালিয়ে আসা সেই ভদ্রমহিলার শুধুই বেঁচে থাকবার জন্য এবং সন্তান-সন্ততিদের কোন প্রকারে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সাহায্যের ছিল একান্তই প্রয়োজন। তাঁর সেই অসহায় অবস্থা সেদিন স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধেয় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। সেই সময়ের সেই সকল অসহায় হতভাগ্য ছিন্নমূল মানুষদের, দেশ বিভাগের ফলে যাঁরা প্রায় একবস্ত্রে সন্তান-সন্ততিদের হাত ধরে নিতান্তই প্রাণ এবং মান বাঁচাবার তাগিদে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই অসহায় অবস্থা খুব কাছের থেকে সম্যক যাঁরা দৃষ্টিগোচর না করেছেন তাঁরা আজ তাঁদের সেদিনের সেই অবস্থা কল্পনাও করতে পারবেন না।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিঠিতে সন্তোষকুমার দত্তকে লিখলেন ঃ

"প্রিয় সন্তোষবাবু,

এই চিঠি নিয়ে যে বৃদ্ধা আপনার কাছে যাচ্ছেন তাঁর কাছ থেকেই সব জানতে পারবেন। আপনাকে আর কি বলব! আপনার প্রাণে অসহায়দের প্রতি দরদ আছে, তাই যা করবার করবেন। একদিন আসুন না কেন? অনেকদিন তো বসে গল্প করা হয়নি। ......"

এই চিঠি পাবার পর সেই অসহায় বৃদ্ধা মহিলাকে সন্তোষকুমার দত্ত বিজয়গড়ে পুনর্বাসনের সব রকম ব্যবস্থাই সেদিন করে দিয়েছিলেন।

নয়

এভিকৃশন বিল প্রয়োগ। বিজয়গড়ে প্রতিবাদ সভা। উদ্বাস্তু মন্ত্রী আভা মাইতির নিকট প্রতিবাদ। আচার্য বিনোবা ভাবের বিজয়গড় পরিদর্শন।

১৯৬২ সালে Eviction Bill কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে কোর্ট অর্ডার নিয়ে বিজয়গড়ের আশপাশের কয়েকটি উদ্বাস্তু উপনিবেশের উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের জন্য পুলিশ হামলা চালায়। এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তাঁর "The Marginal Men" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

"The police came with a Court decree for the eviction of a squatter family at Regent Colony. The house was demolished and the inmates thrown to the streets. The Police came to Asokenagar Colony at Tollygunge with orders for the demolition of fortyfive houses. A shock wave went through the squatters colonies of Tollygunge...."

এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য সমস্ত উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ দলমত নির্বিশেষে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

এই উপলক্ষে বিজয়গড়ে সমস্ত উদ্বাস্তুদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। বিশাল জনসমাবেশ ঘটল এই অধিবেশনে। এই অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল মিলেমিশে অভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য একটি কমিটি তৈরী করলেন এবং এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিজয়গড়ের সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত।

এর পরের ঘটনা প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তাঁর "The Marginal Men" গ্রন্থে যেমন উল্লেখ করেছেন ঃ

".......The first move of the Committee was to wait on Ava Maity, the State Rehabilitation Minister. Santosh Datta, the famed East Bengal Congress leader with Yugantar background, was the spokesman of the Committee. He bluntly told the Minister that if she sent the police to evict the refugees, they would have to kill him first before they evicted a single refugee plotholder from any of these colonies. The Minister re-

monstrated that the eviction orders were decree of the Court and the police had to implement them. Santosh Datta retorted that he could not care less. Ava Maity knew that Datta with his illustrious terrorist past was a man of few words and he meant every word of what he said. Finally, she suggested a way out of the difficulty. She would send a secret Circular to the Police ruling out the use of lathis or bullets for the execution of the eviction decrees. When the landowners sought help the police would certainly go to execute the decrees but would carefully refrain from using force in order not to create a difficult law and order situation. That settled the issue of eviction from high-price land and the curtain fell on the drama of Act XVI of 1951."

পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী যুগান্তর দলের বিশিষ্ট নেতা এবং কংগ্রেস কর্মী শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার দত্ত কমিটির মুখপাত্র হিসেবে তৎকালীন রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু ও ত্রাণ মন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া আভা মাইতির সাথে কথা বলেন। সন্তোষকুমার দত্ত পরিষ্কারভাবে তাঁকে জানিয়ে দেন যে তিনি যদি পুলিশ পাঠিয়ে এই উদ্বাস্তু অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের প্রচেষ্টা চালান তা হলে একটি পরিবারকেও উচ্ছেদ করবার আগে সন্তোষকুমার দত্তকে হত্যা করতে হবে প্রথম। মন্ত্রী মহোদয়া কোর্টের আদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ করলে সন্তোষকুমার দত্ত গর্জন করে ওঠেন। তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে তিনি সে বিষয়ে কোন প্রকার বক্তব্য গ্রাহ্য করতে রাজী নন। শ্রদ্ধেয়া আভা মাইতি সন্তোষকুমার দত্ত'র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অতীত বিপ্লবী ইতিহাস জানতেন। তিনি এটাও জানতেন যে অল্প কথার মানুষ সন্তোষকুমার দত্ত মুখে যে কথা বলেছেন, কাজেও তিনি সেটাই পরিণত করবেন। শেষ পর্যন্ত একটি সমঝোতা-সূত্র বের করা হ'ল। জমির মালিকদের অনুরোধে উদ্বাস্তু অঞ্চলে পুলিশ এলেও বলপ্রয়োগ করে আইন শৃঙ্খলার কোন প্রকার বিঘ্ন তারা ঘটাবে না।

এই ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটল।

এর পরের ইতিহাস এগিয়ে যাবার, শুধুই সম্মুখে এগিয়ে যাবার।

কিন্তু যে উদ্বাস্তু অঞ্চল একান্তভাবেই নিজেদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, সেই অঞ্চলকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বৈধকরণ করিয়ে নেওয়াও ছিল একান্ত আবশ্যক এবং সেই কারণে সন্তোষকুমার দত্ত'র নেতৃত্বে এই উদ্বাস্তু অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বৈধকরণ করিয়ে নেবার প্রচেষ্টা চলছিল সেই সময়।

ভূদান যজ্ঞের পুরোধা ছিলেন আচার্য বিনোবা ভাবে। তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভূদান যজ্ঞ ছিল একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী অধ্যায়। একদিন আচার্য বিনোবা ভাবে কর্ম উপলক্ষে কলকাতা আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূদান আন্দোলনের তৎকালীন নেতা শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীকে সাথে নিয়ে বিজয়গড় অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে যান।

এই উদ্বাস্তু অঞ্চলকে বৈধকরণ করবার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার অনুরোধ জানিয়ে সেই সময় সন্তোষকুমার দত্ত তাঁর হাতে এই অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এই বিস্তৃত অঞ্চলকে সরকার কর্তৃক বৈধকরণ করাবার উদ্দেশ্যে তাঁর সহযোগিতা কামনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই উদ্বাস্তু অঞ্চলকে তখন বৈধকরণ করিয়ে নেওয়াই ছিল নেতৃবৃন্দের প্রধান উদ্দেশ্য।

যে স্থান বিজয় করে নিয়ে দুর্গের মতন স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছিলেন তৎকালীন নেতৃবৃন্দ, সেই স্থানই একদিন "বিজয়গড়" নামে পরিচিত হয়ে উঠল সমগ্র ভারতবর্ষে। উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায়, এই উদ্বাস্তু অঞ্চলেরই সেই সময়ের আরো অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী ফণীভূষণ দত্ত, মণি দাস, রাইমোহন দাস, পূর্ণেন্দু মজুমদার, হেমরঞ্জন ধর, কুঞ্জ মুখার্জী, প্রফুল্ল গুহ, ডাঃ নিকুঞ্জ চক্রবর্তী, অতুল ঘোষদস্তিদার, হলধর মজুমদার, সুকুমার বসু ঠাকুর, ব্রজেশ্বর মণ্ডল, সুধাংশু সেনগুপ্ত, শান্তি সেন, অমূল্য ঘোষ, প্রিয়লাল চ্যাটার্জী, গোপেশ চ্যাটার্জী, নীলরতন চৌধুরী, অমূল্য চ্যাটার্জী এবং আরো বহুজন, আজ যাঁরা অনেকেই বেঁচে নেই কিংবা যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরাও বয়সের ভারে ন্যুব্জ, বিশেষ করে সেই সময়ের যুব সম্প্রদায়—আজ যাঁরা বয়স্ক হয়ে উঠেছেন, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় সর্বপ্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশ হিসেবে গড়ে উঠল এই বিজয়গড়।

দশ

বর্তমানে বিজয়গড়

যদি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই সকল হিন্দু পরিবার সে দিন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পেয়ে এইভাবে জবর-দখল করে নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে এতদিনে তাঁরা হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিভিন্ন সরকারী শিবিরে ঘৃণিত জীবনযাপন করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কয়েক সহস্র হিন্দু পরিবারের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আজ যে অবস্থায় দিন কাটছে তাঁদের ভাগ্যেও সেটাই ঘটত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরোক্ষ সমর্থন এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর অবদান এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে উল্লেখিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিজয়গড় যখন গড়ে উঠছিল সেই সময়ে এই বিজয়গড়ে প্রায় আঠারোশ পরিবারকে কেন্দ্র করে প্রায় বিশ হাজার মানুষের প্রাণ সঞ্চার ঘটেছে ধীরে ধীরে এই নির্জন প্রান্তরে।

কিন্তু এই দীর্ঘ বৎসর পর বিজয়গড়ের বর্তমান রূপ দেখে অতীতের কথা বুঝবার, জানবার কিংবা অনুভব করবার মন বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের ও অধুনা আগত অধিবাসীদের থাকবার কথা নয়। আজকের বিজয়গড়ের বুকে দাঁড়িয়ে বিজয়গড় সৃষ্টির সেই অতীত দিনগুলির ইতিহাস যাঁরা না জানেন তাঁদের পক্ষে সে সব কল্পনা করাও অসম্ভব।

আজ বিজয়গড়ে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যাও বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যাও বিশ হাজারকে ছাড়িয়ে গেছে অনেকদিন।

অনেকেই আজ সুন্দর পাকা বাড়ি তৈরি করে বিজয়গড়ের সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন এবং বাড়ির কতকাংশ ভাড়া দিয়ে আয়ের সুবন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আজ গড়ে তুলেছেন এখানে।

মাত্র দশ আনা মূলধন করে একদিন যে "বিজয়গড় কলেজ" গড়ে উঠেছিল এই বিজয়গড়ের বুকে, সেই কলেজ এখন দুই সময়ে চলছে। দিবা বিভাগ এবং নৈশ বিভাগ। দিবা বিভাগে আর্টস এবং সায়েন্স রয়েছে। নৈশ বিভাগে রয়েছে আর্টস এবং কমার্স। অনার্স খোলা হয়েছে বাংলা, ইংরাজী এবং

অ্যাকাউন্টেন্সিতে। অন্যান্য বিষয়েও অনার্স খুলবার চেষ্টা চলছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। কলেজের অনেক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। আরো উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে।

বিজয়গড়ের বহু ছেলেমেয়ে আজ কৃতী সন্তানরূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই স্কুল কলেজেই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি ভারতের বাইরেও নানা স্থানে বহুজন সম্মানের সাথে কাজ করছেন এবং স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করছেন।

আজ বিজয়গড় ও অন্যান্য কলোনীতে সরকার কর্তৃক নানা প্রকার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হয়েছে অনেক। অনেক উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে চতুর্দিকে।

কিন্তু যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, গভীর মমত্ববোধে, আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও কর্ম দক্ষতায় এই উপনিবেশ একদিন গড়ে উঠেছিল, যাঁরা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থের কথা ভুলে নির্যাতিত ও অনাদৃত মানুষের মধ্যে সেদিন আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে এই বিরাট কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে যেন বিজয়গড়ের বর্তমান অধিবাসীরা না ভুলে যান। গভীর শ্রদ্ধা এবং বেদনার সাথে তাঁদেরকে স্মরণ করাই হবে তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানাবার প্রকৃষ্ট উপায়।

একাদশ

পরিশিষ্ট

বিজয়গড় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে মনে করেন যে বিজয়গড় সর্বপ্রথম উদ্বাস্তুদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা উপনিবেশ বা কলোনী হলেও জবর দখল কলোনী বলতে যা বোঝায় বিজয়গড় ঠিক সেই সংজ্ঞায় পড়ে না। কিন্তু আমার এতক্ষণের আলোচনায় সম্ভবত এ-কথা প্রতীয়মান করা সম্ভব হয়েছে যে বিজয়গড়ই ছিল প্রথম জবর-দখল উপনিবেশ। অন্যান্য উপনিবেশ অপেক্ষা এর বৈশিষ্ট্য ছিল শুধু এটুকুই যে অন্যান্য উপনিবেশগুলি গড়ে উঠেছিল তৎকালীন জমিদার কিংবা অন্যান্য মালিকদের নিজস্ব জমির উপর। কিন্তু বিজয়গড় গড়ে উঠেছিল শুধুই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যদের অস্থায়ী শিবির গড়ে তুলবার প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত এবং যুদ্ধান্তে সৈন্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গার উপর। বিজয়গড়ের এই পুরো জমিটাই ছিল তখনো সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জায়গা। যদিও যুদ্ধ পরিসমাপ্তিতে এই সকল জমির মালিকরা তাদের জমি পুনরায় ফিরে পাবার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টাই তখন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরই ফলশ্রুতি লয়েলকার পাঠানো কয়েক লরি গুণ্ডাদের সাথে তৎকালীন বিজয়গড়ের অধিবাসীদের বসতি রক্ষা করে বেঁচে থাকবার জন্য লড়াই। যার পরিসমাপ্তি ঘটল মামলার ভিতর দিয়ে। বিজয়গড়ের তৎকালীন অধিবাসীদের এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভিতর এই জাতীয় হামলার আশঙ্কা সব সময়ই ছিল। তাঁরা সকল সময়ই আশঙ্কা করছিলেন যে আবারও অনুরূপ হামলা করে এই অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তুদের হয়তো তুলে দেবার চেষ্টা করা হবে। কেননা সেই জমির দাম ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে এই জমি সরকারের কাছ থেকে অধিগ্রহণ মুক্ত করে নিজেদের দখলে নিতে পারলে তাঁরা যথেষ্ট লাভবান হতেন। কিন্তু উদ্বাস্তুরা এই জমির উপর বসে পড়লে এই জমি ফেরৎ পাওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে বিজয়গড়ের তৎকালীন সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই)-কে সাথে নিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাস ভবনে তাঁর সাথে দেখা করতে যান এবং বিস্তারিত আলোচনা হয় যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজেই প্রতীয়মান হয় যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিজয়গড়ে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠবার বিষয়ে সমর্থন প্রথম অবস্থায় করেননি। পরবর্তী কালে সন্তোষকুমার দত্ত'র যুক্তি মেনে নিয়ে তিনি তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন করেন। আসলে, অসম্ভব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন বলেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষে সেদিন সম্ভব হয়েছিল সন্তোষকুমার দত্ত'র যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে চিন্তা করা। অবশ্যই এটা তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মহানুভবতারই পরিচয়। অনুমান করা যায়, এরপর থেকেই তিনি "বিজয়গড়" উদ্বাস্তু উপনিবেশ সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, শ্রীযুক্ত চিত্ত দে'র বক্তব্য থেকে আরো জানা যায় যে বর্তমান বিজয়গড় বালিকা বিদ্যাপীঠ এবং তৎসংলগ্ন কিছু জায়গা ছিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের। তিনি সেই জায়গার দাবীও উদ্বাস্তুদের স্বার্থে পরিত্যাগ করেন। যদিও এই অঞ্চলের সরকারী স্বীকৃতি তখন পর্যন্তও পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে, "বিজয়গড়" ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সমর্থন পেলেও সর্বপ্রথম জবর দখল কলোনী হিসেবেই এর সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সময়ের গণ সংগ্রাম এবং বিজয়গড়কে কেন্দ্র করে যে গণ আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সন্তোষকুমার দত্ত'র সাথে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুদীর্ঘ কালের সৌহার্দ্যের ফলেই অসম্ভব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একদিন উদার মনোভাবে মেনে নিয়েছিলেন যে "বিজয়গড়"-কে, তাকেই পরে সরকারী স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সে অনেকদিন পরের ঘটনা।

এভাবেই গড়ে উঠেছিল বিজয়গড়, নিতান্তই অসহায় কিছু মানুষের নিদারুণ কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে। যে স্থান ছিল প্রায় জনহীন, সেই স্থান জুড়েই আজ নতুন প্রজন্মের কলকাকলি; ক্রমোন্নতির শিখর দেশে আরোহণের দৃঢ় অঙ্গীকার।

চিত্রাবলী

সন্তোষকুমার দত্ত
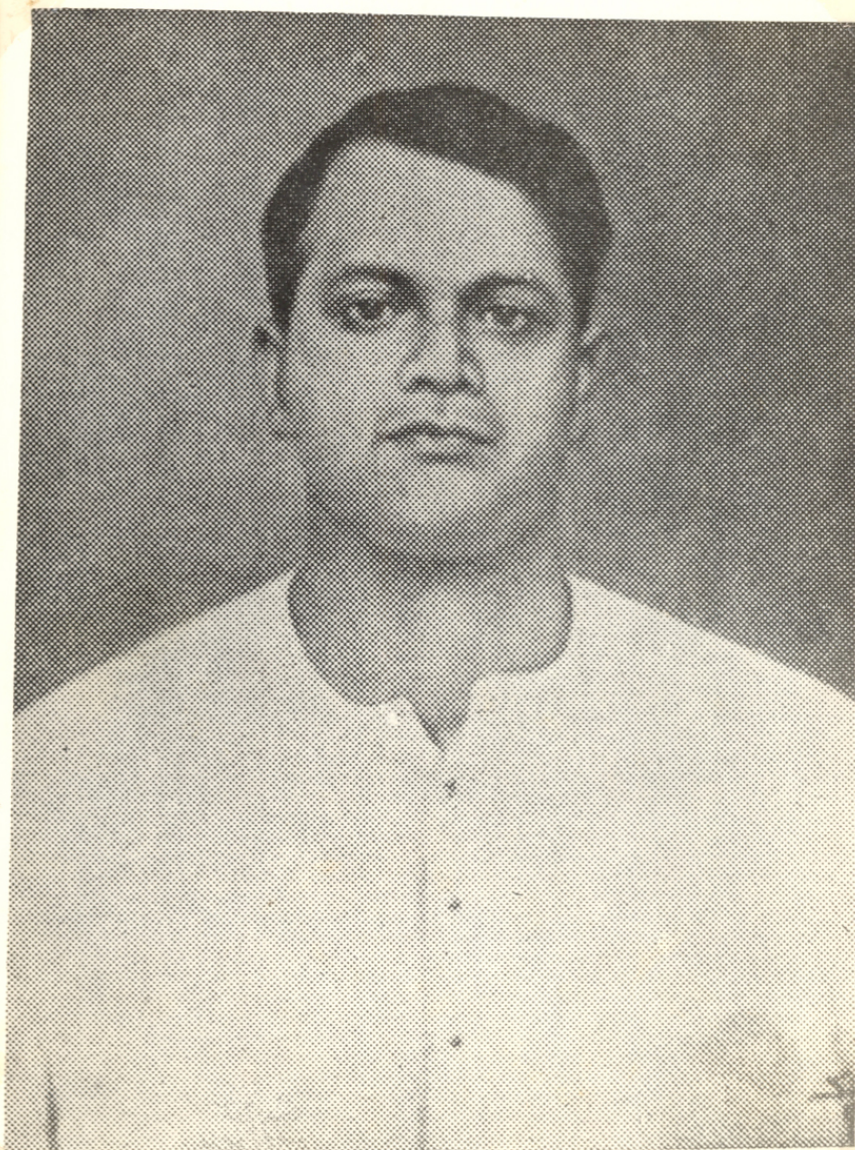
১৯৩৯ সালে কারামুক্তির পর সন্তোষকুমার দত্ত।
(মহাজাতি সদনে রক্ষিত ছবি)

৯২

←—— 11 cm ——→

বিজয়গড় কলেজের সামনে (বামদিক থেকে) ঃ
সমর চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সন্তোষকুমার দত্ত, কলেজের সৃষ্টির ইতিহাস সংবলিত মানপত্র পাঠরত অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা।

বিজয়গড় বিদ্যাপীঠে নেতাজী জন্মোৎসবে পতাকা উত্তোলনের পর সম্মুখে দণ্ডায়মান সন্তোষকুমার দত্ত।
পেছনে বামদিক থেকে ঃ
হরপ্রসাদ কাঞ্জিলাল, সুকুমার চ্যাটার্জী, বিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য (প্রধান শিক্ষক) এবং অন্যান্যরা।

11 cm

১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৪। বিজয়গড়স্থিত নিজবাড়ির সম্মুখে অন্তিম শয়ানে সন্তোষকুমার দত্ত।

স্বাধীনতা দিবসে বিজয়গড় বিদ্যাপীঠে পতাকা উত্তোলন করছেন
বিজয়কুমার মজুমদার। পেছনে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (কালাভাই)

বিজয়গড় কলেজ

এই মিলিটারি ব্যারাকেই কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
সম্মুখে রাস্তা সংলগ্ন খেলার মাঠ।

নগেন্দ্রনাথ পাল

ভূপেন্দ্রলাল নাগ
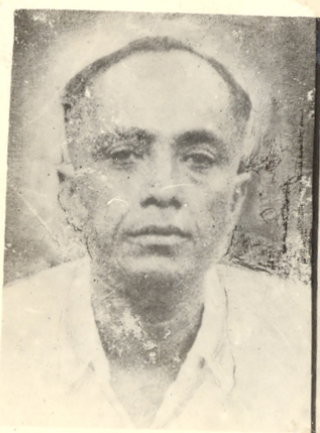
নলিনীমোহন দাশগুপ্ত
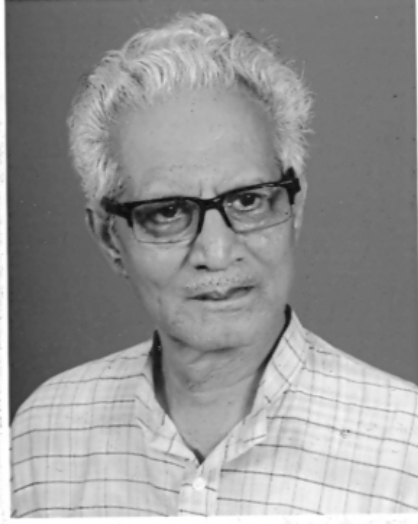
দেবব্রত দত্ত পেশায় গ্রন্থাগারিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম. এ. এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতক। দীর্ঘদিন ধরে বিজয়গড় কলেজের গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত। কৈশোরেই বিজয়গড়ে আগমন এবং বিজয়গড় গড়ে উঠবার সময়ের অনেক ঘটনারই সাক্ষি। দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য-চর্চায় নিযুক্ত রয়েছেন। "চার দশকের কবিতা" লেখকের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।